আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই

একটি বিকল্প ভাবনা

অজয় রায়
শহিদুল ইসলাম
জিয়াউদ্দিন তারেক আলী
সাইফুর রহমান তারিক

আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই

একটি বিকল্প ভাবনা

www.pathagar.com

আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই

একটি বিকল্প ভাবনা

অজয় রায়
শহিদুল ইসলাম
জিয়াউদ্দিন তারেক আলী
সাইফুর রহমান তারিক

ঐতিহ্য ● আইইডি

www.pathagar.com

আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই

একটি বিকল্প ভাবনা

অজয় রায়
শহিদুল ইসলাম
জিয়াউদ্দিন তারেক আলী
সাইফুর রহমান তারিক

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ (আইইডি)
জুন ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ (ঐতিহ্য)
মাঘ ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত ষাট টাকা

AMRA KEE DHORONER SHIKKHA CHAI :
EKTI BIKALPO BHABNA (Education We Want:
An Alternative Idea) by Ajoy Roy, Shahidul Islam,
Ziauddin Tarek Ali, Saifur Rahman Tarik.
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2013.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2013 Institute for Environment and Development (IED)
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 360.00 US$ 10.00
ISBN 978-984-776-099-5

www.pathagar.com

পূর্বকথা

যেকোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি, বহুত্ববাদী ও মানবিকতা বোধসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি। আর এটি নিশ্চিত করতে পারে সমতাভিত্তিক, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে চলমান সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো যার ঘাটতি রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমরা যা কিছুই অর্জন করি না কেন, তাকে হতে হবে একই সঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে সন্তোষজনক। অর্থাৎ শুধু পরিমাণগত অর্জন নয়, দরকার গুণগত অর্জন নিশ্চিত করাও। নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনার পর, তা সে যে পর্যায়ই হোক, শিক্ষার্থী যেন মাত্রানুযায়ী নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো দক্ষতা ও মনোবল অর্জন করতে পারে এবং একজন আলোকিত মানুষ হবার পন্থা খুঁজে পায়। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ বরাবরই এ ধরনের মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। কারণ স্বাধীনতার পরে চার দশক সময় অতিক্রান্ত হলেও সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতিভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাই আমরা এখনো চালু করে উঠতে পারিনি।

গত কয়েক বছরে দেশে শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হারও বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার গুণগতমান এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির বিষয়টি যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, ততটা গুরুত্ব একে কোনো সরকারের শাসনামলেই দেওয়া হয়নি। অথচ সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে জরুরি।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদর্শন নিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে অনেক আন্দোলন-আলোচনা-লেখালেখি হয়েছে। এর ফলে উল্লেখযোগ্য অর্জনও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সে অর্জন ধরে রেখে আমরা ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারিনি। লক্ষণীয় যে, এ যাবৎকাল যে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে সেসব আন্দোলনে সাধারণত চলতি শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে কর্মী পর্যায় পর্যন্ত সেখানে একটি অস্পষ্টতা ছিল যে, প্রত্যাশিত পরিবর্তিত শিক্ষার কাঠামোটি কীরকম হবে বা নতুন পাঠক্রমে কী কী বিষয় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীরের পরিকল্পনা ও গবেষকদের সঙ্গে তাঁর সার্বক্ষণিক আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে এ গবেষণাগ্রন্থে আমরা সে ঘাটতিটিই পূরণ করতে চেয়েছি।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থে আমরা শুধু এটি বলিনি যে চলতি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতিটি বর্তমান সময়ে অকার্যকর, বরং তার সাথে আমরা এ-ও বলতে চেয়েছি যে আমাদের প্রত্যাশিত আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থাটির কীরকম হওয়া উচিত। যে কারণে আমরা মনে করি, এই গবেষণাকর্মটি শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে একটি লক্ষ্য স্থির করতে সহায়তা করবে এবং প্রাপ্ত রেফারেন্সের ভিত্তিতে তাঁরা এই প্রস্তাবনাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক সরকারই তাদের নিজেদের মতো করে সংস্কারের নামে কমিশন গঠন ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করেছে। যদিও এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক বছর নতুন পাঠ্যসূচির চমক ছাড়া প্রায় আর কিছুই পায়নি। সর্বশেষ ২০১০-এ মহাজোট সরকার নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। অতীতের অন্যান্য শিক্ষানীতির তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এটি পরিপূর্ণভাবে আমাদের প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ এখনো একটি জনকল্যাণমুখী ও মানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষানীতি পায়নি। এটিও শেষ পর্যন্ত একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়ে গেছে। কারণ বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে যেসব সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার পুরোপুরি প্রয়োগ এখনো সময়ের ব্যাপার। এর ভালোমন্দ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কাজেই আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

চলতি শিক্ষানীতি ঘোষণার পরও আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ ধারার শিক্ষা ইত্যাদি নানামুখী ধারার শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। বিদ্যমান এসব বিভিন্নমুখী শিক্ষার সিলেবাসে বৈষম্যমূলক, সাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানচেতনাবিরোধী ও নারীবিদ্বেষী উপাদানের অস্তিত্ব এখনো রয়ে গেছে, যা স্বাধীন, চিন্তাশীল ও মুক্তমনের মানুষ তৈরির পথে একটা মূর্তিমান প্রতিবন্ধকতা। এরকম শিক্ষা সৃজনশীল, মুক্তমনা, বহুত্ববাদী মানসিকতাসম্পন্ন, আধুনিক ও আলোকিত মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে কি না সে ব্যাপারে সবসময়ই সবাই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি, এজন্য প্রয়োজন সমতাভিত্তিক, যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা, যে শিক্ষা গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনবে। যে শিক্ষা হবে সংবিধান অনুযায়ী সকল নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, জাতিগোষ্ঠীর অধিকার তথা মানবাধিকারের অনুকূলে। যে শিক্ষা অর্জন শেষে প্রত্যেকেই যোগ্যতা অনুযায়ী কম-বেশি উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবে।

শিক্ষাসংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজ সদস্যদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের ভিত্তিতে অধ্যাপক অজয় রায়ের নেতৃত্বে প্রফেসর শহিদুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ও সাইফুর রহমান

www.pathagar.com

তারিকের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাকর্মটির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ২০০৫-এ, যা পরবর্তী বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর সঙ্গত কারণেই শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। গবেষণার এ পর্বে নতুন ধরনের কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনার যে ভিত্তিকাঠামোটি রচিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে আরও কাজ করে তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশা করি সে কাজ আমরা করে উঠতে পারব। তবে তার আগেই দুষ্প্রাপ্যতা হেতু এ প্রয়াসটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এটি পুনঃপ্রকাশে আগ্রহ দেখানোয় আমরা আনন্দিত হয়েছি। তাকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মনে করি, এই গবেষণাকর্মের নতুন সংস্করণটিও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

এ গবেষণাকর্মটি মুখ্য গবেষক ও তাঁর সহযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। রোকেয়া কবীর ছাড়াও গবেষক দলকে কাজটি এগিয়ে নিতে পরামর্শ ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, প্রাক্তন মুখ্যসচিব ড. এস এ সামাদ, অর্থনীতিবিদ ড. মশিউর রহমান, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের উপ-পরিচালক শাহনাজ সুমী ও সমন্বয়কারী মুজিব মেহদীসহ আরও অনেকে। গবেষকগণসহ এ গবেষণাসংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আইইডির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটির মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি ইতিবাচক কোনো দিক-নির্দেশনা পান, তবেই আমাদের এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করব।

ঢাকা, জানুয়ারি ২০১২

নুমান আহম্মদ খান
নির্বাহী পরিচালক, আইইডি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিক্রম

প্রস্তাবনা

শিক্ষাদর্শন/১৩

সমীক্ষা পদ্ধতি/১৫

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা : বিকল্প ভাবনা

১. শিক্ষানীতি/১৭

১.১ শিক্ষার সংজ্ঞা/১৭

১.২ শিক্ষানীতির সারকথা/১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামো

২. বিদ্যমান শিক্ষাদান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার/২৩

২.১ ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষাব্যবস্থা/২৩

২.২ ব্রিটিশরাজের পরিত্যক্ত শিক্ষাপদ্ধতি ও বর্তমান অবস্থা/২৫

২.২.১ সাধারণ বা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা/২৫

২.২.২ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম/২৬

২.৩ বিদ্যমান শিক্ষার সমস্যা ও প্রকৃতি এবং আমাদের প্রত্যাশিত শিক্ষা/২৯

২.৪ আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাকাঠামো/৩১

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষার অবকাঠামো

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম/৩২

৩.১ প্রাক-প্রাথমিক/৩২

৩.২ প্রাথমিক/৩৪

৩.৩ শিক্ষাক্রম : প্রাথমিক ও প্রাইমারি পর্ব/৩৫

৩.৩.১ প্রাথমিক ও প্রাইমারি পর্বে শিক্ষা ও পাঠক্রম/৩৭

৩.৩.২ প্রস্তাবিত পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় নিয়ে পর্যালোচনা/৩৯

www.pathagar.com

৩.৩.৩ প্রাথমিক পর্বে বর্তমানে চালু অনান্য শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ/৪৬

৩.৪ মাধ্যমিক : শিক্ষার উদ্দেশ্য/৪৯

৩.৫ শিক্ষাক্রম : মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্ব/৫০

৩.৫.১ মাধ্যমিক ও সেকেন্ডারি পর্বের শিক্ষা ও পাঠক্রম/৫১

৩.৫.২ 'ও-এ' লেভেলভিত্তিক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে 'মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম/৫৪

৩.৬ উচ্চ-মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পর্বের শিক্ষা ও পাঠক্রম/৫৫

৩.৬.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক অবস্থান/৫৯

৩.৬.২ সহ-পাঠক্রম/পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মতৎপরতা/৬০

৩.৭ উচ্চশিক্ষা/৬১

৩.৭.১ সাধারণ উচ্চশিক্ষা/৬১

৩.৭.২ পেশাজীবী ও প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষা/৬২

চতুর্থ অধ্যায় : বিকল্প ভাবনা

৪. আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই/৬৩

৪.১ সুপারিশমালা/৬৫

৪.১.১ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক/৬৫

৪.১.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক/৭০

৪.১.৩ নীতিশক্ষা/৭৫

৪.১.৪ মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ/৭৬

৪.১.৫ মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য/৮২

৪.১.৬ক মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারত্ব/৮৩

৪.১.৬খ মাদ্রাসা সম্বন্ধে অভিযোগ/৮৪

৪.২ উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর পেশাজীবী শিক্ষা/৮৫

৪.৩ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন/৮৫

৪.৪ আমাদের সুপারিশে যা নেই/৮৮

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সম্ভাব্য তালিকা/৯১

পরিশিষ্ট ২ : বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ/৯৪

পরিশিষ্ট ৩ : মাদ্রাসা শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা/১০১

পরিশিষ্ট ৪ : ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা/১০৫

পরিশিষ্ট ৫ : জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশমালা/১০৭

পরিশিষ্ট ৬ : সিডও এবং এমডিজি সনদ/১১৩

পরিশিষ্ট ৭ : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত/১১৫

পরিশিষ্ট ৮ : কর্মশালা, মতবিনিময় ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ/১১৭

পরিশিষ্ট ৯ : বিশিষ্টজনের মতামত/১২২

পরিশিষ্ট ১০ : শিক্ষা নিয়ে জ্ঞানী মানুষদের ভাবনা/১৫৭

পরিশিষ্ট ১১ : 'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' : উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম/১৬৮

পরিশিষ্ট ১২ : বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ : অজয় রায় ও শহিদুল ইসলাম/১৬৯

তথ্যসূত্র/১৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। কেবল শিক্ষাব্যবস্থাই নয় যেকোনো ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। তবে অন্যসব ব্যবস্থার ওপর ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রভাব এতটা সরাসরি নয়।

বাংলাদেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থান এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, একটি লোকায়ত বিজ্ঞানমনস্ক এবং একই ধারার গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা বেশ শক্ত। কারণ, আমাদের সংবিধানের আর সেই সেক্যুলার ভিত্তিটি নেই, ফলে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিও যথেষ্ট উদার গণতান্ত্রিক নয়। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই একটি সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বৈজ্ঞানিক, সেক্যুলার ও একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার চেষ্টা একটি ব্যর্থ পণ্ডিতসুলভ অনুশীলনে পর্যবসিত হতে বাধ্য, যদি না রাষ্ট্র তার অনুকূলে কাজ করে।

রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তার প্রমাণ উপস্থিত থাকে। রাষ্ট্রের সংবিধানসম্মত সিদ্ধান্তে এ সবকিছুই পরিষ্কার থাকে। আমাদের সংবিধানেও গণতান্ত্রিক, সর্বজনীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার দাবি সমর্থিত হয়েছে। যদিও স্বাধীনতার চার দশক পরেও নানাবিধ কারণে তেমন শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকান দেশসমূহের ক্ষেত্রেও সার্বিক চিত্র মোটামুটি একই। সমাজ ও ধর্ম সেসব দেশেও প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে, তার তৈরি রাষ্ট্রেরও সীমাবদ্ধতা থাকা তাই স্বাভাবিক। এসব সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও মানুষ স্বপ্ন দেখে একটি সমতাপূর্ণ সমাজের, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের, একটি উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এবং এই রাষ্ট্রোপযোগী একটি সুন্দর শিক্ষাদর্শন রচনার, যার ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষাদর্শন

দর্শন শব্দের একটি অর্থ হলো দেখা, সুতরাং শিক্ষাকে যে দৃষ্টিতে আমরা দেখি তাই শিক্ষাদর্শন; কিন্তু দর্শন তো শুধু দেখা নয়, এর অর্থ জ্ঞানান্বেষণের পথ বা সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থা। সুতরাং শিক্ষাদর্শন বলতে আমরা বুঝব শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞানান্বেষণের পথ আবিষ্কার। শিক্ষা সম্পর্কে

www.pathagar.com

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা হলো মানবিক চেতনা সম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরি, যে মানুষ দেশ ও সমাজের বোঝা না হয়ে হবে কর্মনিষ্ঠ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'— এই প্রবাদপ্রতিম কাব্যপঙক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করবে।

আমরা প্রায়শ বলে থাকি যে আমাদের দেশে শিক্ষানীতি বলে কিছু নেই। একদিক দিয়ে কথাটি ঠিক আবার সেটি অসত্যও। 'সরকার যা ভালো মনে করবেন'— তাই হলো বর্তমানে চালু শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লে. জে. এরশাদের সরকার হঠাৎ করেই শিক্ষাবিদ বা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে স্কুলের নিচু শ্রেণি থেকে আরবি ভাষা ও ধর্মকে বাধ্যতামূলক করে বসে। পরবর্তীকালের সরকারগুলো একইভাবে বিজ্ঞান ও গণিতচর্চাকে অবহেলার মুখে ঠেলে দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে কখনো কৃষিশিক্ষাকে আবার কখনো বা ধর্মকে বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত করে।

শিক্ষাদর্শন ছাড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায় না। প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলে থাকে একটি দর্শন, যার ভিত্তিতে রচিত হয় সে দেশের শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থাই শিক্ষাব্যবস্থা। আর এর নির্মাণ-রসদ হচ্ছে সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। সুতরাং আমরা মনে করি, আমাদের শিক্ষাদর্শন বিনির্মাণের ভিতটি তৈরি করবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও লোকজ চিন্তাচেতনা।

পাশাপাশি এর সাথে যুক্ত থাকবে বিশ্বজনীনতা, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা এবং অতি অবশ্যই মানবিকতাবোধ বা মানবতন্ত্র। তাহলেই একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজের জন্য উপকারী, উপযোগী ও কার্যকরী হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হবে। তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানস গঠিত হবে এবং বিশ্বনাগরিক চৈতন্য বিকশিত হবে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাদর্শনে অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলা ও বাঙালি সমাজের সেই ঐতিহ্যিক উপাদানগুলো, যা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এগুলো হলো—

- বহুত্ববাদিতা (Pluralism) ও বৈচিত্র্যময়তা (Diversity)
- বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব (Unity in diversity)
- মানবিকতা (Humanism) এবং
- ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সম্প্রীতির মাঝে বসবাসের ঐতিহ্য অর্থাৎ 'ইহজাগতিকতা' (Secularism)

www.pathagar.com

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাজগতে মানবতা ও মানবাধিকার— এই দুটি বোধ ও চেতনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া চাই। আর এই ধারণাগুলো বহিরাগত নয়, আমাদের লোকসংস্কৃতি থেকেই উৎসারিত— বহুকাল আগে থেকেই আমাদের লোককবিরা গেয়ে চলেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।* এই নীতিই হলো আমাদের সেক্যুলার সমাজের মূলস্তম্ভ। আমাদের লোককবিরা যুগ যুগ ধরে প্রচার করে আসছেন, যা বাঙালির অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে যে—

"নানান বরন গাভীরে ভাই,
একই বরন দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখি, সবই
একই মায়ের পুত"

যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' কথা। অন্যদিকে লালনের গানে বলা হয়েছে—

"মনুষ্যত্ব যার সত্য হয় মনে,
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?"

অথবা,

"মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ রতনধন
করো সেই মানুষের অন্বেষণ।"

এ তো আবহমান বাংলার 'মানবতার জয়গান'।[১]

সমীক্ষা পদ্ধতি

এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য, পূর্বে বর্ণিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে 'শিক্ষাব্যবস্থা'র একটি সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি করা, যে রূপরেখাটি উত্থাপন করবে একটি সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার ও এক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা। এটি প্রণয়নকালে দেশের সংবিধান ও বিভিন্ন সময়ে গৃহীত জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশমালা এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতাকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন করতে এ সমীক্ষায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

---

* এই বাংলারই গ্রামের কবি চণ্ডীদাস পঁচশো বছর আগে রচনা করেছিলেন এই গান, যা আজো আমরা আমাদের চেতনায় ধারণ করে আছি।

www.pathagar.com

- বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনসহ শিক্ষাবিষয়ক নানা কাগজপত্র, যেমন ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা।
- নির্বাচিত শিক্ষা ও শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ এবং অভিভাবকদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভার আয়োজন এবং শিক্ষক-অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানীগুণীজনের সাথে মতামত বিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এ সমীক্ষার জন্য বিবেচিত) ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সাথে আলোচনা বৈঠক।

এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি পরিবেশিত রূপরেখাটি তৈরিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা : বিকল্প ভাবনা

১. শিক্ষানীতি

এ অধ্যায়ে আমরা প্রথমে শিক্ষার সাধারণ সংজ্ঞা নিয়ে অলোচনা করব, পরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতিগুলোকে তুলে ধরব।

১.১ শিক্ষার সংজ্ঞা

আমরা শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে চাই। আর এই শিক্ষা সংজ্ঞার আলোচনার ভেতর দিয়েই বেরিয়ে আসবে আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই। Encyclopedia Britania-তে শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে অনেকটা এভাবে, 'education, any process, either formal or informal, that shapes the potential of a maturing organism. Informal education results from the constant effect of environment, and its strength in shaping values and habits cannot be overestimated. Formal education is a conscious effort by human society to impart the skills and modes of thought considered essential for social functioning. Techniques of instruction often reflect the attitudes of society, i.e.' এবং সাধারণভাবে শিক্ষার আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে, 'The act, process, or art of imparting knowledge and skill.'

শিক্ষা শব্দটি দিয়ে আমরা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয় প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকি। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝব :

- একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্লীন প্রতিভা ও সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করা ও ফুটিয়ে তোলা যায় এবং জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়; এবং ব্যক্তিবিভবের (potential) পরিপূর্ণ প্রস্ফুটনের মধ্য দিয়ে সমাজবিভবেরও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ইংরেজিতে বলা যায় 'education is a process by which human beings and societies reach their fullest potential'.

www.pathagar.com

- সম্ভাব্য বিভবের (potential) মধ্যে লীন হয়ে থাকা ব্যক্তি বা সমষ্টির জ্ঞান, সৃজনশীলতা, সুকুমারবৃত্তি, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তির বিকাশ।
- ধারণযোগ্য উন্নয়নকে (sustainable development) এগিয়ে নিতে এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোকে দৃঢ়তার সাথে মুখোমুখি হতে মানুষের দক্ষতাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে শিক্ষা একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং শিক্ষা শুধু ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটায় না, এটি সমাজ ও দেশের উন্নয়ন উল্লম্ফনের সাথেও সহসম্পর্কিত (co-related)।
- শিক্ষাকে আমরা এভাবেও দেখতে পারি— 'পাঠ করা ও শেখা', অর্থাৎ মৌলিক ও তাৎপর্যময় অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার আকর গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুকে নিজ চেতনায় প্রতিফলিত করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা, অতীতের সঞ্চিত জ্ঞান অনুধাবন করতে জিজ্ঞাসার ঐতিহ্য সৃষ্টি করা, যা যৌক্তিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগ্রত করে ভবিষ্যৎকে অর্থবহ করে তুলতে পারে।
- উদার চিন্তাধারাপ্রসূত শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা হলো : ১. সমতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে শিক্ষাকে ব্যবহার করা; ২. পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা ও অনুশাসনকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিরোধ করা।

এই কথাগুলো সামনে রেখে আমরা প্রস্তাব করতে চাই যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে— সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার ও একমুখী।

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই ধারণ করবে শিক্ষাদর্শনের ভূমিকা এবং উল্লিখিত প্রত্যয়গুলো। সুতরাং প্রণীত শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হবে ভবিষ্যতের জন্য মানবতাবাদী ও মানবসেবায় উজ্জীবিত সৃষ্টিকুশল মানব সৃষ্টি, যারা দেশের ও সমাজের সম্পদ বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

১.২ শিক্ষানীতির সারকথা

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সারকথাগুলো একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করতে চাই, আর তা হলো— জাতির জন্য একটি 'সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক, একমুখী শিক্ষা', যা শ্রেণি-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্য অনুসরণ করতে হবে।

এই পঞ্চ শব্দগুচ্ছ দিয়ে আমরা কী বোঝাতে চাই, তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

সর্বজনীন

ইংরেজি Universal শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত— এই অর্থেই আমরা সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন শব্দটি ব্যবহার করেছি। বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন শব্দটির ইংরেজি করা হয়েছে Universal. আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে— ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়, নারী-পুরুষ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তথা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি জাতি-গোত্র-ধর্ম-লিঙ্গ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর কাছে সহজলভ্য হবে— একই শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীরা একই পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় অনুসরণ করবে।

সর্বজনীনতা শুধু দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, যেকোনো দেশের নাগরিক আমাদের দেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। শুধু অবস্থানভেদ নয়, বিশ্বের সকল জ্ঞান ও শৃঙ্খলা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই ধারণাগুলোকেই আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি 'সর্বজনীন' শব্দটি দিয়ে।

বৈষম্যহীন

এ কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান নানা ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সুষম শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাই বলতে চেয়েছি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নানাস্তরে বৈষম্য বিদ্যমান। আবহমানকাল থেকে আমাদের রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে নানা বৈচিত্র্যময়, এমনকি পরস্পরবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি চলে এসেছে। ফলে মন-মানসিকতায়, লব্ধ শিক্ষার গুণগত মানে, চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতায়, সমাজ ও দেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথক ও স্বতন্ত্র জলরুদ্ধ কক্ষে (water tight compartment) আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ অবরুদ্ধ।

এক শ্রেণির মানুষের সাথে অন্য শ্রেণির মানুষের সহজ সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটছে না, যা উন্নত সমাজ গঠনের আবশ্যিক শর্ত। এ কারণে মাদ্রাসা পদ্ধতি থেকে আগত শিক্ষিত আলেমের সাথে এ লেভেল পাস চৌকস তরুণের জীবনদর্শনে আকাশসম পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। বৈষম্য রয়েছে নারী-পুরুষের সুবিধা লাভেও, গ্রাম-শহর উভয় পর্যায়ে। বৈষম্য বিদ্যমান ধনী দরিদ্রের অবস্থানগত কারণেও।

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি গ্রামে-শহরে, সামাজিক উঁচু-নিচুতে, ধর্মে-ধর্মে, শ্রেণিতে-শ্রেণিতে কোনো বৈষম্য রচনা করবে না। শহর-বন্দর কিংবা অজপাড়াগাঁ অথবা ঝোপ-কুঠুরি যাই হোক, অবস্থান নির্বিশেষে সকলের কাছে শিক্ষা সুবিধা পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার যে শিক্ষাপদ্ধতিতে থাকবে, তাকেই আমরা বলব বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি। আর তার ভিত্তিতে প্রণীত ব্যবস্থাকে বলব বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা।

www.pathagar.com

একটিমাত্র অভেদাত্মক শিক্ষাব্যবস্থাকেই আমরা বলতে চাই বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা শুধু সর্বজনীনতাকে ধারণ করবে না, তাকে রক্ষাও করবে। খাঁটি ও সংবেদনশীল মানুষ তৈরি করতে হলে শিক্ষার্থীর মনে বৈষম্যহীন চেতনার বিকাশ ঘটানো জরুরি।

সেক্যুলার (ইহজাগতিক বা লোকায়ত)

সেক্যুলারিজম (secularism) শব্দের কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা ইহজাগতিকতা বা লোকায়ত শব্দ দুটিকে ব্যবহার করতে পারি। পুনঃপুনঃ রাজনৈতিক অপব্যবহারের কারণে অনেকেই এর অর্থ দাঁড় করিয়েছেন 'নিরীশ্বরবাদিতা' (atheism)। এটি অতি অবশ্যই ঠিক নয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের ভিন্নতা করা হয়, এবং দুটিকে এক করে দেখাও হয় না। আমরা এর দার্শনিক আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি যে 'নিরীশ্বরবাদিতা' বা atheism হলো এমন একটি মতবাদ, যা কোনো ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না (a doctrine of disbelief in the existence if God), অন্যদিকে সেক্যুলারিজম (secularism) ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, ইহজগতের বিষয় নিয়েই তার অনুশীলন ও অধ্যয়ন (any 'ism' pertaining to the present world or to things not spiritual; the belief that the state, morals, education etc. should be independent of religion)।

মূলত ধারণাটিকে তার স্বরূপে এখনো উপস্থাপনই করা হয়নি। এর সোজা অর্থ হলো রাষ্ট্র নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে নাক গলাবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র সর্বদা একটি বিশ্বাসনিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে। ধর্ম হবে নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস—রাষ্ট্রের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হবে না বা প্রভাবিত করবে না। আর সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরা পরস্পরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ইহজাগতিক বা সেক্যুলার সিস্টেম।

সেক্যুলার শব্দের অধিকতর চালু প্রতিশব্দ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, যা আমাদের দেশের '৭২-এর সংবিধানে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পেছনের নির্গলিতার্থ দর্শন ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ধর্মের কোনো স্থান থাকবে না, রাষ্ট্রের সুযোগসুবিধা সকলের কাছে অবাধ, কোনো বিশ্বাসের নিরিখে তা বিচার্য নয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে সকল নাগরিক সমান। বলা বাহুল্য যে, এর দ্বারা কখনোই নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, বরং সংবিধানে সকল ধর্মপালনের নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে ভাবের সমস্যা নেই, সমস্যাটা ছিল প্রয়োগের।

www.pathagar.com

বস্তুত সেক্যুলারিজম (ইহজাগতিকতা অথবা ইহলৌকিকতা) এমন এক সমাজের কথা বলে, যার মূলে রয়েছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই দর্শন। 'মানবতাবাদ', বহুত্ববাদিতা (pluralism), বৈচিত্র্যময়তা (diversity) এবং যুক্তিবাদ এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। বাংলায় ইহজাগতিকতার অর্থ হলো ইহজগৎ-সম্পর্কিত— আমাদের দৃশ্যমান জগতের বাইরের কোনো কিছুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অর্থাৎ আধিভৌতিক জগৎ বা আধ্যাত্মবাদ (metaphysical world or spiritualism) সম্পর্কে নিস্পৃহতা। আমরা সেক্যুলারিজমকে এই অর্থে ব্যবহার করেছি।

আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে যেমন সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিকতার অধিষ্ঠান চাই, তেমনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও তার প্রতিফলন দেখতে চাই। এর আর একটি অর্থ হলো শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য বা কোনো শ্রেণিবিশেষের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার সংরক্ষিত থাকবে না; রাষ্ট্রায়ত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সবার অধিকার থাকবে সমান। ধর্ম-শ্রেণি-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী একটি একক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন করবে। মানবতাবোধে জাগ্রত হয়ে তারা শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে কেবল কোনো বিশেষ ধর্মের কথা বা সে বিষয়ক প্রচারণামূলক প্রবন্ধ/গল্প স্থান পাবে না। এ ধরনের শিক্ষাকে আমরা শিক্ষার লোকায়তকরণ (secularization of education) বলতে চাই।

বিজ্ঞানভিত্তিক

এমন ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা মানে কেবল বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠদানের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া। আমরা যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করতে চাই, শিক্ষাদানে ও গ্রহণে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাই, তাতে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে বিজ্ঞানমনস্ক। বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার মানে হলো মুক্তচিন্তার ধারক ও যুক্তিবাদী উদার মনের অধিকারী হওয়া। সবাইকে বিজ্ঞান পড়িয়ে কেবল বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা কৃষিবিদ তৈরি করা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণী মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলা।

এক কথায়, যুক্তিনিষ্ঠভাবে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা প্রয়োগে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করা— যেখানে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কোনো স্থান থাকবে না। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে মুক্তমনা ও মুক্তচিন্তার অধিকারী মানুষ সম্বলিত একটি উদার সমাজ। একেই আমরা বলতে চাই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। বিজ্ঞান চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রায়োগিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলাই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কেবল কিছু বিষয়ই জানবে না, বাস্তব জীবনে সেগুলো প্রয়োগের কৌশল ও যৌক্তিকতাও নির্ধারণ করতে পারবে।

www.pathagar.com

একমুখী

একমুখী বলতে আমরা বোঝাতে চাই— সকলের জন্য প্রাথমিক থেকে একটি একক বা একস্রোত বিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে unitary or one stream system. সেটি কোনো একক শৃঙ্খলাবিষয়ক (monodisciplinary) শিক্ষাদান নয়। এর স্পষ্ট অর্থ হলো একজন শিক্ষার্থী একটি মাত্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত নানা বিষয়ে ও শৃঙ্খলায় শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন করবে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমানে যে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি, যেমন— সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা-মক্তব-টোল-চতুষ্পাঠী অবকাঠামোগত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন থেকে এ লেভেল স্কুলব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেওয়া শিক্ষা— তার অবসান ঘটবে। যেমন প্রাথমিক স্তর থেকে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি) সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাব্যবস্থা অনুমোদিত একটিমাত্র শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তা তারা যে বিদ্যায়তনেই পড়াশোনা করুক না কেন। পরবর্তী স্তরগুলোতে, যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ শৃঙ্খলায় একাধিক ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবর্তন করা যেতে পারে— যেমন মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক, সংগীতবিদ্যা, 'নীতি ও ধর্ম' (ethics) ইত্যাদি।

আমরা যখন 'একক ও লোকায়ত বা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার' (Unitary and secular education system) কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা কোনো ধর্মরহিত সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্পনা করি না। যেহেতু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র হয়ে উঠবে সেক্যুলার, তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে এই সেক্যুলারিজম নীতির প্রতিফলন ঘটবে, একেই আমরা শিক্ষার সেক্যুলারাইজেশন বা লোকায়তকরণ বলতে চাই।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে বিদ্যমান শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম, পাঠপদ্ধতি ইত্যাদির বিশদ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন দরকার। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত সনদ, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম, রাজনৈতিক দলসমূহের শিক্ষাসম্পর্কিত কর্মসূচির পর্যালোচনা দরকার। সেই সাথে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মতামতও বিবেচনায় নেওয়া দরকার। এই প্রতিবেদনে সে চেষ্টাই করা হয়েছে, যাতে আমাদের ভাবনার একটা বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব হয়। একমুখী শব্দটি দিয়ে আমরা যে ধারণাটি বোঝাতে চাই, তা বোঝাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছে 'একই পদ্ধতি' আর ইরেজিতে বলা হয়েছে ' Uniform', আর জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে এই ধারণাটি প্রকাশ করা হয়েছে 'Unitary' শব্দটি দিয়ে (যেমন : Elementary education shall be compulsory and unitary।)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামো

২. বিদ্যমান শিক্ষাদান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

দেশে সুষ্ঠু ও স্পষ্ট শিক্ষানীতি না থাকলেও একটি শিক্ষা-অবয়ব রয়েছে, যার মাধ্যমে শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষাদান বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে দেওয়া হয়।

২.১ ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষাব্যবস্থা

ব্রিটিশ যুগের প্রায় দুশো বছর এবং পাকিস্তানি শাসনের চব্বিশ বছর কালকে বাংলাদেশের জন্য ঔপনিবেশিক কাল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ব্রিটিশরা ক্ষমতা গ্রহণকালে বাংলাদেশে একদিকে পাঠশালা-চতুষ্পাঠী ও অন্যদিকে মসজিদ-মক্তব ভিত্তিক যে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, তার স্থানে নিজেদের প্রয়োজনে একটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সরকারি কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে, তাই সনাতনী মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিউক্লিয়াস ধরে তার ওপর যৎসামান্য আধুনিকতার মিশেল ঘটিয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় 'ক্যালকাটা এলিয়া ম্যাড্রাসা' নামে একটি আধুনিক মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেছিলেন ১৭৮১ সালে। এ প্রসঙ্গে হেস্টিংসের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, 'ক্রিমিনাল কোর্টে, পুলিশ বিভাগে এবং অন্যান্য কাজে মুসলমানদের নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ...এ প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে মুসলমান শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে সরকারি কাজে যোগ দিতে পারে।'[২] উল্লেখ্য যে, ফারসি তখনো কোর্টের ভাষা, তাই বিচার কাজে সহায়তার জন্য ফারসি জানা মুসলিম কর্মচারীর প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে এই নব্য প্রতিষ্ঠানে আরবি, ফারসি, উর্দু, কোরান, হাদিস, ফিকাহ্ ছাড়াও ইংরেজিসহ কিছু কিছু আধুনিক বিষয় ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, ফলে কলকাতা মাদ্রাসা কেন্দ্রিক নব্যমাদ্রাসা শিক্ষা ও সনাতনী মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হতে থাকে। সেই থেকে আমাদের দেশের ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা

www.pathagar.com

বোর্ড এবং এই বোর্ডের অধীনস্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্য ও ক্রমধারা বহন করে আসছে।

এর দশ বছর পরেই ভারসাম্য রক্ষার জন্য জোনাথন ডানকান কর্তৃক একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় বারানসীতে ১৭৯১ সালে। উভয় প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাদান চলতে থাকে সনাতনী বিষয়ে ও প্রথায়। উদ্দেশ্য মোল্লা আর পুরোহিত সৃষ্টি। এখানে যুক্তিবাদী উদার চিন্তার স্থান ছিল না, প্রাগ্রসর নতুন বিদ্যার, জ্ঞানের প্রবেশ ও চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। উভয় সম্প্রদায়ই খুশি— ইংরেজ তাদের ধর্ম ও জীবনাচারে হস্তক্ষেপ করছে না। সমাজকে অন্ধ রাখাই ইংরেজদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না— এতে শাসন ও শোষণের সুবিধা। এরই ধারাবাহিকতায় চাহিদা না-থাকা ও রামমোহনসহ প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের গোড়ায় (১৮২৪) কলকাতাতেও একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজি ভাষা রাজকীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করলে কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের গুরুত্বও কমে আসে ইংরেজদের চোখে। এরই পরিণতিতে ১৮৩৫ সালে প্রবর্তিত হয় মেকলে প্রণীত আধুনিক ব্রিটিশ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা, এর মূল উদ্দেশ্য যতটা না ভারতীয় প্রজাদের আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে আলোকিত করা, তার চাইতে ব্রিটিশ শাসনকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে একদল ভারতীয় এলিট তৈরি করা, যারা ইংরেজ শাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে গাত্রবর্ণে না হলেও চিন্তা চেতনায় ও ভাবাদর্শে হয়ে উঠবে ইংরেজ।* মেকলের একটি সুপারিশ ছিল ক্যালকাটা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের অবলুপ্তি এবং সরকারি অর্থানুকূল্যে আরবি, ফারসি বা সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রকাশ না করা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' ১৮৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের বছরেই।

মেকলে প্রণীত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা নানা কমিশন ও কমিটির সুপারিশে পরিবর্তিত হতে হতে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের আগে একটি স্থিতধী রূপ লাভ করে। নানা সময়ে প্রদত্ত যেসব শিক্ষা কমিটি ও কমিশনের সুপারিশে শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো— ১৯০৭-'০৮ সালের আর্ল কমিটি, লর্ড কার্জনের সিমলা শিক্ষা কমিটি (১৯০১), ১৯১৪ সালে গঠিত নাথান কমিটি এবং স্যাডলার কমিশন (১৯১৯)। নাথান কমিটিতে মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল, যারই

---

*মেকলে প্রণীত এই শিক্ষা পদ্ধতির নাম ছিল 'Filteration Theory'. In a statement মেকলে বলেছিলেন, 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern— a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in morals and intellect.'

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে ১৯১৫ সালে প্রবর্তিত হয় মাদ্রাসা নিউ স্কিম সিস্টেম, যেখানে বলা হয়েছিল পাঠ্যসূচি থেকে ফারসি তুলে দিয়ে বাংলা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির।

২.২ ব্রিটিশ রাজের পরিত্যক্ত শিক্ষাপদ্ধতি ও বর্তমান অবস্থা

(বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ নিয়ে সর্বশেষ ১২ নম্বর পরিশিষ্টে আলোচনা করা হয়েছে)।

ইংরেজ শাসক দেশ ছাড়ার কালে তৎকালীন বাংলায় যে শিক্ষা কাঠামোটি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম, বিভিন্ন সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেটির বর্তমান রূপটি দাঁড়িয়েছে—

২.২.১ সাধারণ বা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা

- ১ম ধাপ : প্রথম বা প্রাথমিক (Primary) ৫ বছর মেয়াদি : ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি (বয়স ৬-১১)
- ২য় ধাপ : মাধ্যমিক ধাপ, যেটি বর্তমানে তিনটি পর্বে বিভক্ত—

(ক) নিম্ন-মাধ্যমিক (Lower secondary) ৩ বছর মেয়াদি : ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি (বয়স ১১-১৪)।

(খ) মাধ্যমিক (Secondary) ২ বছর মেয়াদি : ৯ম-১০ম শ্রেণি (বয়স ১৪-১৬)। বর্তমানে মাধ্যমিকে তিনটি বিশেষ শৃঙ্খলাভিত্তিক শাখা রয়েছে— মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান। এই শিক্ষা পর্বান্তে সরকার চালিত সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ হতে হয়।

(গ) উচ্চ-মাধ্যমিক (Higher Secondary) ২ বছর মেয়াদি : ১১-১২শ শ্রেণি (বয়স ১৬-১৮)। এই স্তরেও উক্ত তিনটি শাখা রয়েছে। এই শিক্ষা পর্বান্তে ও সরকার চালিত সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ হতে হয়।

উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর নিয়ে ইংরেজ আমল থেকে পাকিস্তানি যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ লর্ড কার্জন (১৯০১) থেকে শুরু করে আকরাম খান পর্যন্ত (১৯৪৯) অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, যেমন উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের দু'বছরের কোর্সকে অবলুপ্ত করে প্রবেশিকাকে ১১শ পর্যন্ত করা এবং স্নাতক ডিগ্রিকে তিন বছর করা। ১৯৭৪ সালে প্রণীত খুদা কমিশনের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছিল, '...১১শ শ্রেণির স্কুল শিক্ষা এবং ৩ বছরব্যাপী সাধারণ স্নাতক ডিগ্রি কোর্স প্রচলিত হওয়া দরকার।' তবে বাস্তবতার নিরিখে কমিশন এই ব্যবস্থাটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তনের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক স্কুলে চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, লর্ড কার্জনের আমল থেকে মাধ্যমিককে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আর স্নাতক কোর্সকে ৩ বছর মেয়াদি করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা

www.pathagar.com

অনেক হয়েছে, যা সমাজে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। সমাজ মোটামুটিভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা— এই চারটি ধাপবিশিষ্ট অবকাঠামোকে মেনে নিয়েছে।

- ৩য় ধাপ : উচ্চতর (Higher) শিক্ষা। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সাধারণ ডিগ্রি, কোনো বিশেষ বিষয়ে সম্মান নিয়ে ডিগ্রি, কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা শাস্ত্র... ইত্যাদিতে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জাতের বিভিন্ন ধরনের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে যে কয়েক ধরনের সুযোগ রয়েছে তা হলো—

উচ্চশিক্ষা (কলেজ/বিশেষ ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়)

ক. ডিগ্রি কোর্স

১. সাধারণ ডিগ্রি কোর্স : ৩ বছর মেয়াদি

২. অনার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদিতে... ডিগ্রি কোর্স : ৪ বছর মেয়াদি

খ. স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি... ইত্যাদি)

চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্সকে সাধারণভাবে প্রান্তিক ডিগ্রি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই ব্যবস্থাটিই নানা ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় বলবৎ আছে। এই চার ধাপবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা বর্তমান শিক্ষা কাঠামোয় স্থান পেয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক স্তরে ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে (ইংরেজ আমলে যে স্তরটিকে বলা হতো Intermediate) ইংরেজ আমল থেকে নানা সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৩ বছর মেয়াদি সম্মান কোর্সের ডিগ্রি ও ১ বছরব্যাপী মাস্টার্স ডিগ্রি দানের ব্যবস্থা চালু ছিল।

২.২.২ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম

ক. মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষাদান ব্যবস্থার পাশাপাশি স্কুল ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষাদান কার্যক্রম যে কাঠামোর মাধ্যমে দান করা হয় তা নিম্নরূপ :

প্রাথমিক বা এবতেদায়ি (বছরের কোনো সঠিক সীমা নেই) : প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি (৫ বছর মেয়াদি)

দাখিল : ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি (৫ বছর মেয়াদি)।

www.pathagar.com

দাখিল স্তরে সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ ৩টি এবং অতিরিক্ত ইসলামি শাখা রয়েছে। এবতেদায়ি ও দাখিল মিলে এই স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত হয় ১০ বছরে, সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ।

আলিম : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (২ বছর মেয়াদি)।

সাধারণ উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের মতো এই কোর্সের মেয়াদও দু'বছর এবং মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও ইসলামি বিশেষ শাখায় শিক্ষা দান করা হয়।

মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা (ফাজিল ও কামিল)

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় দুটি স্তরে—

১. ফাজিল (দু'বছর মেয়াদি) : এই স্তরের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ দু'বছর মেয়াদি ডিগ্রির সাথে এবং
২. কামিল (দু'বছর মেয়াদি) : এই স্তরের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ দু'বছর মেয়াদি এমএ ডিগ্রির সাথে তুলনীয় বলে দাবি করা হয়।

এ দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে সমাজে বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহল থেকে এর প্রবল বিরোধিতা করা হচ্ছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবক্তারা এই সমতুল্যতার দাবি করে আসছেন এবং সরকারি চাকরি থেকে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা দাবি করে আসছেন। সম্প্রতি সরকার এ ব্যাপারে মোটামুটি সম্মতিসূচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন এবং এই সমতুল্যতা কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির ওপর দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে।*

সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্রোতের বাইরে ইসলাম ধর্মভিত্তিক একটি প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা নামে। একে মক্তবভিত্তিক শিক্ষাও বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে মাজার ও মসজিদভিত্তিক বা স্বতন্ত্র মক্তব, ফোরকানিয়া, হাফেজি প্রমুখ নানা নামে মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিচালিত হচ্ছে। মূলত ধর্মপাঠের ভিত্তি হিসেবেই এই শিক্ষা মুসলিম সমাজে চালু ছিল। এই মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার মাধ্যম আরবি, ফারসি বা উর্দু।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নামে পরিচিত বেসরকারি উদ্যোগে চালিত একটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি বাংলাদেশে বিদ্যমান, যা খারিজি মাদ্রাসা শিক্ষা

---

* কমিটি একটি ধনাত্মক সুপারিশ করে এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু নির্দেশনা দেয়। কমিটির সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীতও হয়, যা বাস্তবায়নের পথে। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি সংসদে একটি বিল পাস হয়েছে। এর পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকেও সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গেও সংসদে একটি বিল পাস হয়েছে।

www.pathagar.com

নামেও পরিচিত। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা আবার নানা ধারায় বিভক্ত। যেমন ভারতে চালিত 'দেওবন্দ' পন্থীদের অনুসৃত কওমি। কওমি জাতীয় মাদ্রাসাগুলোতে মূলত কোরান, হাদিস ও ফিকহ্ ও আরবি ভাষা হলো পাঠের বিষয়, এবং শিক্ষা আরম্ভ ও সমাপনের কোনো নির্দিষ্ট বাঁধাধরা সময়সীমা নেই। এসব মাদ্রাসার সংখ্যা ও পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঠিক হিসেব জানা যায় না।

খ. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক টোল/ চতুষ্পাঠী শিক্ষাব্যবস্থা

এই ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকালের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রেশ হিসেবে কঙ্কালসার অবস্থায় বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো টিকে আছে, তবে এর প্রভাব হিন্দু বা বৌদ্ধসমাজে অনুভূত হয় না। এই শিক্ষা টোল ও সংস্কৃত/পালি কলেজের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। সংস্কৃত/পালি ভাষা-সাহিত্য-ব্যাকরণ ভিত্তিক এই শিক্ষা তিনটি স্তরে প্রদান করা হয়ে থাকে—

সারণি ২.১ : *সংস্কৃত ও পালি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান*

স্তরের নাম	শ্রেণি ও মেয়াদ	মন্তব্য
সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক		
আদ্য	৭ম শ্রেণি থেকে দু'বছর	
মধ্য	আদ্য পরবর্তী চার বছর	
উপাধি	মধ্য পরবর্তী চার বছর	

পালি ভাষাভিত্তিক		
আদ্য	৭ম শ্রেণি থেকে তিন বছর	
মধ্য	আদ্য পরবর্তী তিন বছর	
উপাধি	মধ্য পরবর্তী তিন বছর	

যতদূর জানা যায়, সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ৯০-এর মতো এবং কলেজ রয়েছে ৫-৭টি। শিক্ষার্থী সংখ্যা সঠিক জানা যায় না, তবে কয়েক হাজারের বেশি নয়। অন্যদিকে পালি টোলের সংখ্যা ৩০-৪০টির মতো এবং কলেজ রয়েছে ২-৩টি। ছাত্রসংখ্যা হাজারের বেশি নয়।

এছাড়াও রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্ডারগার্টেন, মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারিভাবে পরিচালিত স্কুলের মাধ্যমে ও এবং এ লেভেল ভিত্তিক ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান কার্যক্রম। যেহেতু এ দুটি শিক্ষা কার্যক্রম আমরা ব্রিটিশ ঐতিহ্য থেকে পাইনি, তাই এখানে এদের সম্পর্কে কিছু বলা হলো না। পরে যথাস্থানে এদের শিক্ষা কার্যক্রম ও অনানুষ্ঠানিক বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা স্থান পাবে।

www.pathagar.com

২.৩ বিদ্যমান শিক্ষার সমস্যা ও প্রকৃতি এবং আমাদের প্রত্যাশিত শিক্ষা

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তাকে প্রকৃতার্থে কোনো সংহত শিক্ষাব্যবস্থা বলা যায় না। কেননা এটি শিক্ষার্থীর মনে কোনো সাধারণ নাগরিকতা বোধ এবং সমশ্রেণি-চেতনা গড়ে তোলে না। তার কারণ এখানে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কোনো সংহত ও সংজ্ঞায়িত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু নেই। যেমন সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান নিয়ে যারা উচ্চ-মাধ্যমিকে পড়ছে তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাদ্রাসায় আলেম শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর এবং এ-লেভেলে পাঠরত শিক্ষার্থীর অনুকরণীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি থেকে স্বতন্ত্র। একাধিক পদ্ধতি একত্রে মিশ্র অবস্থায় চালু আছে, সেসবের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের, এমনকি অনেক সময় পরস্পর আদর্শবিরোধী বিদ্যায়তনের অস্তিত্ব ও অনুসৃত শিক্ষা কার্যক্রম এবং একাধিক পাঠক্রম আমাদের সংবিধানের মূল নীতিমালার সাথে খাপ খায় না। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে একই ধারার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ('একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা') প্রণয়ন অতি অবশ্য পালনীয়, এখানে কোনো ব্যত্যয়ের সুযোগ বা অস্পষ্টতা সংবিধান রাখেনি। (সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)*

আমরা যেসব নীতিমালার আলোকে একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করছি, তার সাথেও এর সঙ্গতি নেই। এসব বিভিন্নধারার শিক্ষার মান যাচাইয়ের কোনো সাধারণ মানদণ্ডও নেই। চলমান শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিকটিও দুর্বল। কারণ একাধিক ধরনের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ নীতিমালাও স্বাভাবিক কারণে এক নয়। কতক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিই নেই। একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলে ব্যবস্থাপনাগত এই জটিলতা আপনিতেই দূর হতো।

একই কারণে সমধর্মী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো গাইডলাইনও তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাই অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হলে ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

---

* The state shall adopt effective measures for the purpose of (a) establishing a uniform. mass oriented and universal system of education and extending free and compulsory education to all children to stage as may be detedined by law.

www.pathagar.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় জনগণ বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ স্পষ্ট নয়। সরকারি স্কুল-কলেজ হলে তাতে অভিভাবক বা জনপ্রতিনিধিদের কোনো অংশগ্রহণই থাকে না। বেসরকারি হলে কিছুটা অংশগ্রহণ দৃষ্ট হয়। অথচ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষেত্রেই জনগণ (অভিভাবক) এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির (বিশেষ করে স্থানীয় সরকার) অংশগ্রহণ থাকতে হবে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের দৃঢ় অবকাঠামোটিই আমাদের দেশে এখনো মজবুত হয়নি। ফলে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির নামে সংসদ সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তি দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্কুলের কার্যক্রম চালিত হচ্ছে, যেখানে সৎ ও যোগ্য শিক্ষকদের এমনকি স্বাধীনচেতা প্রধান শিক্ষকও স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে নির্ভীক স্বাধীনচেতা যোগ্য অভিভাবকেরা স্কুল পরিচালনা কমিটিতে আসতে পারেন না বা আসতে দেওয়া হয় না।

এখন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ভর্তি-নির্ভর। তাগিদ শুধু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোতে। কিন্তু ভর্তি সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটাই মুখ্য বিবেচ্য নয়। শিক্ষার মুখ্য বিবেচ্য মানসম্পন্ন এবং কর্মদক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী গড়ে তোলা। আমরা এক্ষেত্রে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছি। তবে এনরোলমেন্টের হিসেবে আমাদের অগ্রগতি লক্ষণীয় এবং সন্তোষজনক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

আমরা ওপরে যে আদর্শভিত্তিক শিক্ষার কথা বলেছি, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা বা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে। সুতরাং আমাদের শিক্ষার উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে একটি শিক্ষাব্যবস্থা বা অ্যাডুকেশন সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে চিন্তা-ভাবনা, নীতিমালা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠু অবয়ব দিতে চাই, তাকেই আমরা বলতে পারি অ্যাডুকেশন পলিসি বা শিক্ষানীতি।

আধুনিককালে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই শিক্ষার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যদিও পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাদান পদ্ধতিও চালু রয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজ প্রশাসন তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্য প্রবর্তন করে, যার ভিতটা ছিল, স্বীকার করতেই হবে ইহজাগতিকতা। তবে গ্রামেগঞ্জে, এমনকি শহরেও ঐতিহ্যবাহী পাঠশালাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল দীর্ঘদিন। মসজিদভিত্তিক কিছু কিছু মক্তবও ছিল ।

www.pathagar.com

২.৪ আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা অবকাঠামো

আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক (HSC) স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান অবকাঠামোর আনুপূর্বিক ভাঙচুরের যে ইতিহাস বিবৃত করেছি তা থেকে বলা যায়, উপরোল্লিখিত তিনস্তর বিশিষ্ট (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা) অবকাঠামোটি সমাজ গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই অবকাঠামেটি মোটামুটি বজায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিবেচনায় নিয়েই চারস্তর বিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব আমরা রাখতে চাই। অবকাঠামোটির রূপরেখা হলো—

- প্রাক-প্রাথমিক : ৩ বছর মেয়াদি (শিশুর বয়স ৩-৫)
- প্রাথমিক : ৮ বছর মেয়াদি (প্রথম-অষ্টম শ্রেণি : শিশুর বয়স ন্যূনতম ৬ বছর)। বর্তমানের নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি) আর থাকবে না।
- মাধ্যমিক : নবম-দশম শ্রেণি (২ বছর মেয়াদি)
- উচ্চ-মাধ্যমিক : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (২ বছর মেয়াদি)
- উচ্চশিক্ষা : স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (সাধারণ ও পেশাজীবী)

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষার অবকাঠামো

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম

আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যকে নিম্নভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—

৩.১ প্রাক-প্রাথমিক

এই পর্বের শিক্ষা ৩-৫ বছর বয়েসি শিশুদের জন্য। মূলত কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য মায়েদের কর্মপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ফাঁকা, উন্মুক্ত ও নিরাপদ স্থানে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/শিশু যত্ন কেন্দ্র চালু করা উচিত। আমাদের দেশে যদিও এ রীতি মেনে চলা হয় না। পাঠ নয়, খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের মনে শিক্ষা গ্রহণের, পরিবারের বাইরের সমবয়েসি ও অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচিত হওয়ার, চারপাশের জগৎ সম্পর্কে এবং অচেনা পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল গড়ে তোলার কথাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের সুপারিশ হলো শিশুর চার বছর বয়স হওয়ার আগে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করা উচিত হবে না।

আমরা আরও মনে করি যে গৃহের স্নেহবেষ্টনীর আওতায় মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের সান্নিধ্যে লালিত শিশুর বেড়ে ওঠা ও প্রাথমিক শিক্ষালাভ অবশ্যই একটি আদর্শ ব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক সংসারের জটিলতায় গৃহে এই পরিবেশ অনেক সময় সৃষ্টি করা মা-বাবার পক্ষে সম্ভব হয় না, এ কারণে আধুনিক বিশ্বের নানা দেশে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দেখাশোনা ও উপযুক্ত পরিবেশে শিশুদের পরিচর্যা ও বেড়ে ওঠার জন্য শিশুভবন, শিশু উদ্যান ইত্যাদি নানা নামে প্রাক-প্রাথমিক শিশু নিকেতন গড়ে উঠেছে।

ঢাকা শহরে ডে-কেয়ার সেন্টার নামে মূলত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে, প্রধানত উচ্চবিত্তদের চাহিদার ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য যে, এসব শিশুকেন্দ্র আদর্শ ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে। কর্মজীবী ও নারী শ্রমিকদের শিশুদের জন্য এ ধরনের শিশু-যত্ন কেন্দ্র গড়ে উঠছে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ—

- এসব শিশুকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার অভ্যাস, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি সূচিত করা, শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন এবং এর পাশাপাশি আনন্দদায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুকে খানিকটা পঠন-প্রস্তুতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভালোমন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা, যাতে সে প্রাথমিক স্কুলে যেতে অসুবিধা বোধ না করে। তবে শিশুর চার বছর বয়স হওয়ার আগে তাকে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করা উচিত হবে না।
- এ ধরনের শিশু পরিচর্যা নিকেতন বেশি পরিমাণে শিল্প এলাকায় ও গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিল্পমালিকদের উদ্যোগে স্থাপিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শিশু মনস্তত্ত্ব, শিশুযত্ন বিষয়সহ বিশেষভাবে শিক্ষিত নারী শিক্ষক ও সেবিকার প্রয়োজন, আর এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থারও আবশ্যকতা রয়েছে।
- সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং জেলা-উপজেলায় আদর্শ প্রাক-প্রাথমিক শিশু নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।
- শিশুশিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এবং আমাদের দেশের শিশুদের গড় মেধা-মননের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিশুশিক্ষা প্রণালি উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত শিশুশিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা দরকার।
- আমরা অবশ্য কোনো অবস্থাতেই ১ বছরের আগে কোনো শিশুকে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আমাদের সুপারিশ হলো ২ বছর পূর্ণ হলেই, সম্ভব হলে ৩ বছর, কোনো শিশুকে শিশু পরিচর্চা কেন্দ্রে পাঠানো যেতে পারে। প্রয়োজনে মাতৃত্ব ছুটি ১ বছরের করা যেতে পারে এবং পরবর্তী বছরে পিতাকে প্রথম ছয় মাস পিতৃত্ব ছুটি এবং পরবর্তী ছয় মাস মাতাকে পুনরায় মাতৃত্ব ছুটি দানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

এ বিষয়ে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত এ খুদা কমিশনের সুপারিশসমূহের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারিয়ে যায়নি। খুদা কমিশনের সুপারিশসমূহের সারকথা হলো যে, 'জন্ম থেকে প্রথম পাঁচ বছর হচ্ছে মানবজীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।' জীবনের এই স্তরে একটি শিশু যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, লালিত হয় এবং মনের বিকাশ ও বুদ্ধির স্ফুরণ ঘটে, তা পরবর্তী জীবনে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে যায় কমিশনের এই মতের সাথে

www.pathagar.com

আমরাও একমত। এই লক্ষ্যে কমিশন ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী মাতৃস্নেহবেষ্টনী তুল্য শিশু উদ্যান ও শিশুভবন স্থাপনের সুপারিশ করেছে, যেখানে শিশুর মনের বিকাশ ও শরীরের বৃদ্ধি ঘটবে। কমিশনের মতে এজন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার, যিনি স্নেহ-মমতা দিয়ে শিশুর দুরন্তপনাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন এবং তার মনে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তুলতে পারবেন।[৩]

৩.২ প্রাথমিক

আমরা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করতে চাই—

- দেশ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। আমরা সংক্ষেপে প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো এভাবে উত্থাপন করতে পারি— ক. শিশুর নৈতিক, মনো-দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন; খ. তার মনে দেশকে চেনা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতূহল জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা; গ. ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে যেসব মৌলিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদিতা প্রয়োজন হবে, সেসবের সঙ্গে পরিচিত করা, অবশ্য সহজবোধ্য ভাষায় গল্প বা সরস রচনার মধ্য দিয়ে; এবং ঘ. পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দান।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই শিশুদের মধ্যে বিশ্বমানবিক-চেতনা সঞ্চারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হবে, শিশুটি যাতে একটি ইহজাগতিক ও মানবতাবাদী রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিকে পরিণত হয় এবং যাতে তার মধ্যে বিশ্বনাগরিকতাবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়। এবং এটি করতে হবে শিশুদের উপযোগী গল্পের মাধ্যমে ও সরল ভাষায়। এ কথাটি প্রেক্ষাপটে রেখে ক্রমশ শ্রেণিভিত্তিক পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে সহজ ও বোধ্য ভাষায়।
- প্রত্যেক শিশুই অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী। শিশুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে— 'শিশুর হৃদয়মুকুলকে পূর্ণ বিকশিত করা অর্থাৎ তার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা।' শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রতি অগাধ আন্তরিকতা, মমতা ও আস্থা রাখতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য হলো উদ্ভাবনী ও উপযোগী পন্থায় ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিশুদের পরিচর্যা করা, যাতে প্রত্যেকটি শিশু উৎকৃষ্টতম

www.pathagar.com

দক্ষতা নিয়ে ভবিষ্যৎ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের একজন দায়িত্ববান সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠে। এই সুষম শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের সুযোগ সৃষ্টির পশ্চাতে লক্ষ্য থাকবে একটি শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও নান্দনিক অমিত সম্ভাবনা এবং 'বৈচিত্র্যধর্মী সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার' ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।

- প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্যই শিশুকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা এবং পাশাপাশি 'তিন আর' (3 R's) স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, যাতে শিশুটি আর পড়াশোনা না করলেও পড়তে (Reading), লিখতে (WRiting) ও প্রাথমিক হিসেব নিকেশ (ARithmatics) করতে পারে এবং জীবনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। এখন অবশ্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা 'তিন আর' এর পরিবর্তে 'প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন' হওয়ার কথা বলেন (conversant with primary education literature)। অর্থাৎ এই শিক্ষা পর্ব অন্তে শিক্ষার্থী অবশ্যই হবে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক সাহিত্যে জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাথমিক গণিতে অভিজ্ঞ। আমরা এই লক্ষ্যকে আরও বিস্তৃত করতে চাই নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।
- শিক্ষা যেন কোনো স্তরেই, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্বে, বৈষম্যমূলক না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ রেখে শিক্ষাক্রম, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৯৬০ সালে গৃহীত ইউনেস্কোর প্রস্তাবসমূহ স্মরণ করতে চাই।[৪] আমাদের সংবিধানের মূলনীতি ও প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির আলোকে তা বাস্তবায়ন করতে চাই।
- বিশ্বে যেভাবে জ্ঞানের সীমা ক্রমশ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে কথা ভেবে আমরা মনে করি বর্তমানে ৫ম শ্রেণিভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে নিম্ন-মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্বে অন্তর্ভুক্ত করে তা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা এবং নব প্রাথমিক পর্ব হবে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩২ বছর আগে কুদরত এ খুদা কমিশনের সুপারিশও তাই ছিল।[৫]

৩.৩ শিক্ষাক্রম : প্রাথমিক বা প্রাইমারি পর্ব

প্রায় সকল শিক্ষা কমিশনেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ বছর। মনস্তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকদের মতে এই বয়সে শিশুর মস্তিষ্ক বিকশিত হয় এবং গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা অর্জন করে। ৬-১১ বয়ঃকাল শিশুর মন, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ পরিপক্বতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই কালটি শিশুর মন ও বুদ্ধির গঠনকালও বটে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে শিশুর এই কালপর্ব তাদের

www.pathagar.com

মনোবিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধির পর্ব, যা শিখবার অন্তহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তার জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই তার কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। সৃষ্টিশীলতার উন্মেষও ঘটতে থাকে। পিতা-মাতা নির্ভর পারিবারিক বৃত্তের বাইরে তার সামাজিক পরিবেশকে চিনতে শেখে এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে, সমাজের বৈচিত্র্য ও নানা মানুষকে চিনতে শেখে। মানুষের সমাজবদ্ধতা সম্পর্কে তার ধারণা গড়ে ওঠে।

শিশুর এই দৈহিক ও মানসিক গঠনের কথা মনে রেখেই শিশু শিখনবিদরা মনে করেন যে শিক্ষার জন্য এই পর্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের মতে শিশুর এই কালপর্বটি খুব যুৎসই এবং যোগ্য, যখন প্রথাগত শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে তাকে যুক্ত করা উচিত এবং পরিবার ও চেনা জগতের বাইরে দলগত কর্মকাণ্ডের সাথে তার সম্পৃক্ততা ঘটানো প্রয়োজন। আর এটি ঘটতে পারে স্কুলের পরিবেশে, যেখানে একটি শিশু শুধু বয়সানুপাতিক শিক্ষাই লাভ করবে না, দলগত ক্রিয়াকাণ্ড এবং অংশীদারিত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মাবে, ফলে তাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা বাড়বে এবং তারা সমাজ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠবে।

আমরা প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি— সেই আলোচনাকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের প্রস্তাব রাখতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শৈশবে শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন সযত্ন প্রয়াস। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে আবদ্ধ করে রাখলে তার মনের বিকাশ সাধন হয় না। শিশুকে দিতে হবে যথেষ্ট স্বাধীনতা— পাঠের স্বাধীনতা, খেলার স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীল কর্মের স্বাধীনতা। সর্বোপরি সকল ধরনের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যেন থাকে আনন্দ ও স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ। এর ব্যত্যয় ঘটলে শিশুর বয়স বাড়বে ঠিকই কিন্তু মানসিক বিকাশ ঘটবে না আনুপাতিক হারে। মোদ্দাকথা হলো, প্রাথমিক পর্বের শিখন যেন ভীতিকর বোঝায় পরিণত না হয়।

অথচ আমরা অভিভাবকেরা আমাদের সন্তান-সন্ততির বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক বিকাশ ও উন্নয়নের চেয়ে বেশি চাই শিশুরা কত দ্রুত মুখস্থ করে পুঁথিগত বিদ্যা মস্তিষ্কে ধারণ করে শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করে অর্থকরী জীবনে প্রবেশ করতে পারে। মাথায় ও পিঠে বিদ্যার ভারে শিশুরা আজ ন্যুব্জ, সেদিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। ফলে মা বাবার কাছে পুত্র-কন্যার শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, যা অর্থ থাকলেই কেনা যায়। শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য 'মানুষ হওয়ার সাধনা', 'জ্ঞানের অন্বেষণ', 'সৃষ্টির প্রত্যয় আর উৎপাদনমুখীনতা'... ইত্যাদি থেকে ক্রমশ সরে এসেছি আমরা। ফলে শিক্ষার

www.pathagar.com

অর্থকরী দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের চেতনায়, এতে শিক্ষা মানবজীবনের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। শিক্ষার গুরুত্বও সমাজের কাছে কমে আসছে। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী শিখন কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ—

৩.৩.১ প্রাথমিক বা প্রাইমারি পর্বে শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম

আটবছর মেয়াদি প্রাথমিক পর্বের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির নমুনা নিচে ছকের আকারে প্রদান করা হলো।

সারণি ৩.১ : প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ও পঠনীয় বিষয়বস্তু

পাঠ্য/শিক্ষণীয় বিষয়	কোন শ্রেণিতে পড়বে					সপ্তাহে কত ঘণ্টা পড়বে/শিখবে
খেলাধুলা-শরীর চর্চা	১ম-২য় (১)	৩য়-৪র্থ (২)	৫ম (৩)	৬ষ্ঠ-৭ম (৪)	৮ম (৫)	
সুকুমার-সৃষ্টিশীল কর্ম-সংগীত, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি (পদ্য, গদ্য ও রাইম...)	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
হাতে-কলমে (একক ও দলীয়) কাজ, ফুল গাছ লাগান, বাগান-পরিচর্যা ইত্যাদি	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
নিজের পরিচর্যা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা.. ইত্যাদি	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ				
ক. বাংলা : (বাংলা ভাষাভাষী শিশুদের জন্য)	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
খ. বাংলা মাতৃভাষা নয় এমন শিশু, যেমন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ছেলে-মেয়েদের তাদের মাতৃভাষা : সম্যক অক্ষর পরিচিতি, পঠন ও লিখন	তাদের ভাষায় যতদূর যে শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো সম্ভব ততদূর পর্যন্ত পড়ানোর সম্যক চেষ্টা নিতে হবে। পাশাপাশি অবশ্য এসব শিশুদের বাংলাও পড়তে হবে।					
প্রাথমিক অঙ্ক (elementary arithmatic)	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	

www.pathagar.com

পাঠ্য/শিক্ষণীয় বিষয়	কোন শ্রেণিতে পড়বে					সপ্তাহে কত ঘন্টা পড়বে/শিখবে
পরিবেশ ও প্রতিবেশ পরিচিতি	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান* (স্বাস্থ্যবিধি ও নিজ পরিচর্যা, মানব শারীর বিজ্ঞান...)	-	-	-	৬ষ্ঠ-৭ম*	৮ম	
দেশ-পরিচিতি (ভূগোল)	-	-	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
দেশ-পরিচিতি (ইতিহাস): সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি)	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
প্রাথমিক বিজ্ঞান[১] : প্রকৃতি ও পরিবেশ	-	-	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম[১]	৮ম	

---

* এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধির সাথে পুষ্টি সম্পর্কেও জানবে 'স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান' বিষয়ের অধীনে।

১. এই পর্বে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিজ্ঞান পরিচিতিতে পড়বে—
   ক. প্রকৃতি, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু, পরিবেশ
   খ. জীববিদ্যা : উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ
   গ. প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা
   ঘ. প্রাথমিক রসায়ন

২. নীতিশিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে— মানবতাবোধ, সব মানুষের সমান অধিকার, মানবাধিকারের ওপর গুরুত্ব দান, যেহেতু মানবতাবোধ আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ...; এছাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে— বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের ধর্মের সারকথা, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যের কথা ও মানবধর্মী কল্যাণমূলক কথাগুলো আছে তা শিশুদের কাছে তুলে ধরা। কোনো ধর্মই যে অন্য আর একটি ধর্ম থেকে বড় বা ছোট নয়— এ কথাটি জোর দিয়ে বলতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে লেখা অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. উদাহরণ হিসেবে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো— কম্পিউটার লিটারেসি, কম্পিউটার হার্ডওয়ার সংযোজন, ইলেকট্রিশিয়ান, ছুতার, রাজমিস্ত্রি, কৃষি যন্ত্রপাতি চালনা-সংরক্ষণ ও মেরামত, অটোমোবাইল মেকানিক্স, মুদ্রণশিল্প, মৃৎশিল্প, কামার শিল্প, চামড়ার কাজ, বয়নশিল্প, রঞ্জন, ডেকোরেশন ইত্যাদি...

১. আমরা মনে করি ১ম-২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্কুলে প্রতিদিন ২-৩ ঘন্টার বেশি আবদ্ধ থাকবে না, অর্থাৎ স্কুলক্ষেপণকাল হবে ২-৩ ঘন্টা, ৩য়-৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিদিন স্কুলক্ষেপণকাল ৪ ঘন্টা, এবং ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিদিন স্কুলক্ষেপণকাল ৫ ঘন্টা, ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণির জন্য এই কাল হবে ৬ ঘন্টা, আর ৮ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ থাকবে প্রতিদিন ৬-৭ ঘন্টা।

www.pathagar.com

পাঠ্য/শিক্ষণীয় বিষয়	কোন শ্রেণিতে পড়বে					সপ্তাহে কত ঘন্টা পড়বে/শিখবে
নীতিশিক্ষা	-	-	-	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
দ্বিতীয়-ভাষা : ইংরেজি (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অবাংলাভাষী শিক্ষার্থীর জন্য ৩য় ভাষা)		৩য়/৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
তথ্যপ্রযুক্তি-কম্পিউটার : প্রাথমিক ধারণা	-	-	-	৭ম	৮ম	
সহপাঠ/বহির্পাঠক্রম তৎপরতা	১ম-২য়	৩য়-৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ-৭ম	৮ম	
ঐচ্ছিক বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি)[৩]	-	-	-	-	৮ম	

৩.৩.২ প্রস্তাবিত পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় নিয়ে পর্যালোচনা

বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের সাথে মতামত বিনিময় এবং নিবিড় ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়েই একটি সত্যিকার বিজ্ঞানমুখী ও বাস্তবায়ন যোগ্য প্রাথমিক পর্ব-উপযোগী পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও তদনুসারে পাঠ্য পুস্তকাদি রচনা সম্ভব হতে পারে। কাজটি নিঃসন্দেহে দুরূহ ও শ্রমসাধ্য। আমরা নিচে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলাম মাত্র। আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক পর্বের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে কিছু আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো।

১ম ও ২য় শ্রেণি (প্রথম দু'বছর)

১. বয়সোপযোগী বহিঃখেলাধুলা (outdoor sports & games) ও শরীরচর্চা (free hand exercise, drill etc);

---

২. স্কুলের সপ্তাহ হবে ৫ দিন। সুতরাং সে হিসেবে ১ম-২য় শ্রেণির জন্য সপ্তাহে শিখন সময় পাওয়া যাচ্ছে সর্বোচ্চ ১৫ ঘন্টা। এই সময়কেই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ঘন্টা বন্টন করে দেবেন। অনুরূপভাবে প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা সময় ৩য়-৪র্থ শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর, প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্ত ২৫ ঘন্টা ৫ম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর, প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্ত ৩০ ঘন্টা সময় ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণির বিষয়গুলোর ওপর এবং ৮ম শ্রেণিতে সপ্তাহে প্রাপ্ত ৩৫ ঘন্টা নির্ধারিত বিষয়গুলোর ওপর বন্টন করে দেওয়া হবে।

৩. পাঠ্য পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুর আয়তন এত বিপুল হবে না যে, পাঠ্যবিষয় ও পুস্তক সংখ্যা ভীতিপ্রদ ও বোঝা হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

২. সুকুমার ও সৃষ্টিশীল কর্ম : সংগীত (সমবেত ও একক), নৃত্য, আবৃত্তি (পদ্য, গদ্য ও রাইম...); চিত্রাঙ্কণ : পেন্সিল দিয়ে রেখা, বক্র রেখা, বৃত্ত, কোণ, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ; রঙিন পেন্সিল ও মোমরঙের ব্যবহার ইত্যাদি;

৩. হাতেকলমে কাজ : কাগজ দিয়ে ফুল, পাতা, খেলনা ইত্যাদি তৈরি, মাটি-কাদা এবং প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে পুতুল, খেলনা, নানাবিধ বস্তু বানানোর কাজ, ফুলগাছ লাগানো ও পরিচর্যা, দলগতভাবে বাগান পরিচর্যা শেখানো, নিজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজ শেখানো, টয়লেট ও শৌচাগার ব্যবহার শেখানো এবং হাত-পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি;

৪. ক. বাংলাভাষাভাষী শিশুদের জন্য—

বাংলা : সম্যক অক্ষর পরিচিতি (প্রাক-প্রাইমারিতে যাই শিখে আসুক না কেন), পঠন ও লিখন, (এই স্তরে বর্ণপরিচিতিমূলক শিশুতোষ পাঠ্যবই রচনা বেশ দুরূহ এবং বেশ যত্নের সাথে আকর্ষণীয় শৈলীতে তা লিখতে হবে।) এমন কোনো বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়, যা শিশুমনে ভেদাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। 'অ'-তে অজগর আমরা অবশ্যই লিখতে পারি (কিন্তু এ উদাহরণটি খুব আকর্ষণীয় নয়, কারণ আমরা বড়রাই অজগর সাপ দেখিনি, কিন্তু আবহমান কাল ধরে ঐতিহ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে), 'আ'-তে আল্লাহতালা, 'ঈ'-তে ঈশ্বর, কিংবা 'য'-তে যিশু চলতে পারে না।

খ. বাংলা মাতৃভাষা নয় এমন শিশুদের (যেমন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের, জেনাভা ক্যাম্পে অবরুদ্ধ উর্দু/হিন্দিভাষী শিশুদের) জন্য তাদের মাতৃভাষা : সম্যক অক্ষর পরিচিতি, পঠন ও লিখন। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের বৃহত্তর সমাজ ও জাতির এবং নিজেদের স্বার্থে আমাদের প্রস্তাব হলো এই শিশুরা এই স্তর থেকেই বাংলাভাষার সাথে পরিচিত হোক অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে। তাদের জন্য সামান্য একটু বোঝা হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে এটি মেনে নিতেই হবে।

৫. প্রাথমিক অঙ্ক (elementary arithmatic), সংখ্যার সাথে পরিচিতি, শূন্যের ধারণা, অঙ্কপাতন, সাধারণ যোগ ও বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ধারণা;

৬. পরিবেশ পরিচিতি ক. প্রকৃতি : (বাড়ির চারপাশ, গাছপালা, দালানকোঠা, নদী, খালবিল, ক্ষেত...), খ. মানুষ ও তার পরিবেশ : সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিবারের বাইরের আত্মীয়স্বজন, রাস্তাঘাটের মানুষ এবং রাস্তাঘাট, বিচিত্র যানবাহন, ঠেলাগাড়ি, গরুগাড়ি, নৌকা, ভ্যান, রিক্সা, বাস, মোটরগাড়ি ইত্যাদিবিষয়ক

www.pathagar.com

ধারণা। শিক্ষক গল্পের মাধ্যমে চিত্রের সহায়তায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে ক্রমশ পরিচিতির বলয় বৃদ্ধি করবেন, গ. জীবজন্তু : কুকুর, বেড়াল, হাঁসমুরগি, টিকটিকি, আরশোলা, কীটপতঙ্গ— (গ্রামীণ পরিবেশে ঝিঁঝিঁ পোকা, জোনাকি) ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, প্রজাপতি, কেঁচো, সাপ ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা;

৭. স্বাস্থ্যবিধি : নিজের শরীর পরিচর্যা, পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান, দাঁত মাজা, স্নান, টয়লেট ও বাথরুমের কাজ সম্পর্কে শেখানো এবং সাবান বা ছাই দিয়ে হাত-পা পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ পানি পান ও পানিবাহিত সাধারণ উদরাময় ও কলেরা রোগ সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি (দ্বিতীয় দু'বছর)

১. বাংলা : পঠন-লিখন, ছোট ও সরল বাক্য রচনা (কম্পোজিশন), যুক্তাক্ষরের সাথে পরিচিতি।

২. অঙ্ক : উচ্চতর (a little higher arithmetic)— গুণ, ভাগ ও ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ, সরল জ্যামিতি— সরল রেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত ইত্যাদির সাথে পরিচয়, খালিহাতে (free hand) এসব আঁকা এবং স্কেল ও কম্পাসের সাথে পরিচয় ও ব্যবহার। এসব কৌশল ব্যবহার করে নানা ধরনের ড্রইং করতে শেখা— ঘরের মেঝে, প্লেট, ঘড়ি, সরল পথ, বক্র পথ, নদীর আঁকাবাঁকা স্রোত ইত্যাদি।

৩. দেশ পরিচিতি (ভূগোল) : বিভিন্ন অঞ্চলের নাম (বিভাগ, জেলা, থানা, গ্রাম ইত্যাদি), দেশের প্রকৃতি, নদ-নদী, রেলপথ, জলপথ, আবহাওয়া, ষড়ঋতু, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

৪. সমাজ ও সভ্যতা : ক. দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, খ. জন ও জাতি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক লেখা— এখানে থাকবে দেশের সকল ধর্মীয় ও বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষদের পরিচয়— ভাষা, আচার-আচরণ সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি, গ. জেন্ডার সচেতনতা— নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও সমতা।

৫. প্রাথমিক বিজ্ঞান পরিচিতি : প্রকৃতি ও পরিবেশ, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, শব্দ ও আলো, পদার্থ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আকাশ, আবহমণ্ডল, গাছপালার বৈচিত্র্যময় জগৎ (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গাছপালা ও শস্যপ্রদায়ী ওষুধি জাতীয় তৃণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন), উদ্ভিদ জগতের ওপর আমাদের নির্ভরতা, ধান, গম, ডাল, সরিষা, রবিশস্যাদি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৬. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (শরীরের বিশেষ বহিঃঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অস্থি সম্পর্কে পরিচয় ও এসবের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে জানানো এবং এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়া, পেশি ও পেশির কার্যাবলির সাথে পরিচয় ইত্যাদি) ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (যেমন কী কী করলে হাত-পা সচল থাকে, কী ধরনের ব্যায়াম করলে পেশি শক্তিশালী হয়, কী কী খেলে অস্থিবৃদ্ধি ও পেশির সজীবতা বজায় থাকে), সাধারণ রোগ (সর্দিকাশি, বিভিন্ন জ্বর, যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি)।

৭. এই শ্রেণিতে আমরা আমাদের শিক্ষাক্রমে একটি দ্বিতীয় ভাষার স্থান দিতে চাই। যেহেতু (ইংরেজ শাসনের ফলে) ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য চর্চা আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইংরেজি ভাষা দ্রুত আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হচ্ছে— সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সুপারিশ ইংরেজি ভাষার পক্ষে। প্রথম দিকে ছবি দেখিয়ে বা আশপাশের জিনিসপত্র দেখিয়ে ইংরেজি শব্দের সাথে ক্রমশ পরিচয় করিয়ে শিশুর শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলা। মুখস্থ করানোর ওপর জোর না দিয়ে ক্রমে ক্রমে শেখানো। তবে যেহেতু ইংরেজি একটি ইয়োরোপীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতির সাথে খাপ খায় না, তাই আমাদের পরিবেশে এই ভাষা শেখানো অবশ্যই দুরূহ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক তৈরি করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পদ্ধতিতে এই ভাষার সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ কী পদ্ধতিতে শিশুদের ইংরেজি ভাষা শেখাতেন তা স্মরণ করা যেতে পারে।

এর পাশাপাশি শরীরচর্চা ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, সুকুমার বৃত্তির চর্চা (সংগীত— কণ্ঠ ও যন্ত্র, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি...), হাতের সৃষ্টিশীল কাজ অব্যাহত থাকবে (শিক্ষক এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেবেন), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির সাথে পরিচয় করানো, যেমন চাকাওয়ালা খেলনা গাড়ি, গরুগাড়ি বা ঠেলাগাড়ি, রিকশা, স্প্রিং, পিচকারি, মই, টর্চ, বাঁশি, একতারা বা দোতারা, ঢোল ও ঢাক প্রভৃতি ধরনের সংগীত যন্ত্রাদি ইত্যাদি।

৫ম শ্রেণি : পরবর্তী একবছর আরও ব্যাপক হারে চলতে থাকবে—

১. বাংলা : উচ্চতর পঠন-লিখন ও জটিল বাক্য রচনা (কম্পোজিশন) এবং সরল প্রবন্ধ লেখা। কোনো বিষয় পাঠ করে তার বিষয় বর্ণন ও লিখন। সংক্ষিপ্তসার লিখন।

২. অঙ্ক : উচ্চতর (a little higher arithmetic)— গুণ, ভাগ ও ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ, সরল, গড়, দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্কপাতন

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া, ঐকিক নিয়ম, শতকরা, একক পদ্ধতি; দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একক (হাত, গজ, ছটাক, সের, মণ, সেন্টিমিটার, মিটার, গ্রাম, কিলোগ্রাম); পরিমাপন (আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, অসম চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি); জ্যামিতি (বিভিন্ন ধরনের কোণের সাথে পরিচয় ও চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজের সাথে পরিচয় এবং অঙ্কন); সময় সম্পর্কে ধারণা— ঘড়ির ব্যবহার, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি।

৩. দেশ পরিচিতি (ভূগোল) : বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি, নদ-নদী, রেলপথ, জলপথ, আবহাওয়া ও ষড়ঋতু, নকশা ও জরিপ, মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি।

৪. সমাজ ও সভ্যতা (ইতিহাস) : অতীত ও বর্তমান (বাংলাদেশের ইতিহাস, জন ও জাতি)

৫. প্রাথমিক বিজ্ঞান পরিচিতি (জীবজগতের বৈচিত্র্য) : প্রাচীনকালের জীব, প্রাণের উন্মেষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা। আমাদের দেশের ওপর বেশি গুরুত্ব দান, শহরের শিক্ষার্থীদের চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের সাথে পরিচয় করানো, গ্রামে বিভিন্ন ধরনের পাখি, পশু, কীটপতঙ্গ ও গাছপালার সাথে পরিচয় করানো।

৬. নীতিশিক্ষা : নীতিশিক্ষার সারকথা হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে তোলা। উপদেশ দিয়ে নয়, পাঠ্যপুস্তকে গল্পের মাধ্যমে সম্প্রীতির কথা, ভ্রাতৃত্ববোধের কথা, দেশের সব জাত ও ধর্মের মানুষ সমান ও তাদের সমমর্যাদা রয়েছে— একথা বলে মনুষ্যত্ববোধ, অহিংসা, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা ইত্যদি শব্দগুলোর তাৎপর্য গল্প, কথা ও উদাহরণের মাধ্যমে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশে মানুষ সরল ও ধর্মপ্রাণ কিন্তু পরমতসহিষ্ণু— একথাটি মনে রেখে, প্রচলিত বিভিন্ন মানুষের ধর্মের সারকথার সাথে পরিচয় করানো, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যের কথা ও মানবধর্মী কল্যাণমূলক কথাগুলো আছে তা শিশুর কাছে তুলে ধরা। কোনো ধর্মই যে অন্য আরেকটি ধর্ম থেকে বড় বা ছোট নয়, এ কথাটি জোর দিয়ে বলতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে লেখা (জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমমর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে) পড়ানো। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে সমন্বয়বাদী মানবিক ধর্মবোধের কথাও জানাতে হবে। জানাতে হবে চণ্ডীদাস, চৈতন্য, কবীর, লালন, হাসন রাজা, কাঙাল হরিনাথ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, সুভাষ বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু,

www.pathagar.com

রমেশ শীল প্রমুখের কথা। এই নীতিশিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা চায় একটি উদারমনা বাঙালি জন, জাতি ও সমাজ এবং একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

৭. স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পরিচয়— শারীরবিদ্যা, পরিপাকতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র ও এসবের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে জানানো এবং এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়া) ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা (খাদ্য ও পুষ্টি— ভাত, ডাল, শাকসবজি, মাছ-মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতির খাদ্যগুণ ও খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান)।

৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি : এই দু'বছরের পাঠ্যসূচিতে আরও নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

১. বাংলা : নানা বিষয় স্থান পাবে— আমাদের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়, আধুনিক বাংলাভাষার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের লেখার সাথে পরিচয়— গদ্য ও পদ্য, সরল ব্যাকরণ।

২. ইংরেজি ভাষা : শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলার সাথে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার পরের ধাপের শিক্ষা।

৩. গণিত : পাটিগণিতের জটিল পদ্ধতি, ভগ্নাংশের গুণ-ভাগ, ভগ্নাংশের সরল সিঁড়ি ভাঙা, ভগ্নাংশকে দশমিক আকারে লেখা— দশমিকের যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি, সরল বীজগণিতের প্রাথমিক ধারণা ও জ্যামিতি— সমতল ও বক্রতল, ঘনবস্তুর (কিউব) সাথে পরিচিতি, লেখচিত্র, সেট সম্পর্কে ধারণা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাটিগণিতের প্রয়োগ। ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটারের ব্যবহার।

৪. দেশ পরিচিতি (ভূগোল) : দেশ ও বিশ্ব।

৫. সমাজ ও সভ্যতা (ইতিহাস) : অতীত ও বর্তমান (বাংলাদেশের ইতিহাস), ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ইতিহাস, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, কৃষক ও রায়ত বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নাচোল বিদ্রোহ, হাজং ও নানকার বিদ্রোহ, টঙ্ক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্নপর্যায়ের গণ-অধিকারের আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ।

৬. প্রাথমিক বিজ্ঞান পরিচিতি : ক. প্রকৃতি ও উদ্ভিদ জগৎ এবং পরিবেশ, খ. জীববিদ্যা, গ. প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা ও ঘ. প্রাথমিক রসায়ন

৭. নীতিবিষয়ক শিক্ষা : মানবতাবোধ আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ, তাই মানবাধিকারের ওপর গুরুত্ব দান। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, দয়া-ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, সত্যবাদিতা-পরোপকারিতা—

www.pathagar.com

এসব মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বড় মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে শিশুর কাছে তুলে ধরা। ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বা ঠাকুরমার ঝুলির মতো গল্পের মাধ্যমে শিশুকে নীতিশিক্ষা দিতে হবে।

৮. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান।

৯. শারীরবিদ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নানা দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক বিধি (ক্যানসার, এইচআইভি-এইডস ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে জানা ও সচেতনতা সৃষ্টি)।

১০. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও তার ব্যবহার।

৮ম শ্রেণি : (প্রস্তাবিত ৮ম শ্রেণিব্যাপী প্রাথমিক পর্বের শেষ বছর)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও এই শ্রেণিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার বিশদীকরণ ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান। কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে পরিচয় ঘটানো। যেমন যেসব স্কুলে বিজ্ঞানের উপযুক্ত ল্যাবরেটরি নেই, সেখানে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো কম্পিটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদর্শন করা। আবার উপযুক্ত গণিত শিক্ষকের অভাব থাকলে কম্পিউটার-সহায়ক গণিতের প্রোগ্রাম ব্যবহার করে গণিত শেখানো যেতে পারে।

২. মানবাধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন করা। বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাসহ দেশ বিদেশের মানবাধিকার সংস্থাসমূহের কার্যাবলির সাথে পরিচয়, নারী ও শিশু অধিকার (সিডও ও পিকিং ঘোষণা, বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ইত্যাদি), শ্রমিক অধিকারসম্পর্কিত ঘোষণাপত্রগুলোর তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান।

৩. গণিতের কিছু কিছু আধুনিক বিষয় (ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত ছাড়াও বাইনারি সিস্টেম, রুডিমেন্টারি ক্যালকুলাস, পরিসংখ্যান ও জনমিতি)।

৪. জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন— এই তিনটি মৌলিক বিজ্ঞানের বিষয়ে জানাশোনাকে আরও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে আসা।

৫. বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।

৬. এই শ্রেণিতে (সম্ভব হলে) একটি ঐচ্ছিক বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা (কম্পিউটার লিটারেসি, কম্পিউটার হার্ডওয়ার সংযোজন, ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ, ছুতার বা কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ,

www.pathagar.com

কৃষিযন্ত্রপাতি চালনা, সংরক্ষণ ও মেরামত, অটোমোবাইল মেকানিকস, মুদ্রণশিল্প, মৃৎশিল্প, কামার শিল্প, চামড়ার কাজ, বয়নশিল্প, রঞ্জন, ডেকোরেশন, জরিপ ইত্যাদি)

এর সাথে বয়সোপযোগী বহিঃখেলাধুলা (outdoor sports & games) ও শরীরচর্চা, সুকুমার ও সৃষ্টিশীল কর্ম : সংগীত (সমবেত ও একক), নৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি (পদ্য, গদ্য ও রাইম), সূচিকর্ম, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা প্রভৃতি সর্বশ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য অব্যাহত রাখতে হবে।

পাশাপাশি শিশুর মনে যাতে সকল মানুষ সমান ও 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— এই মনোভাব অর্থাৎ মানবতাবাদ ও মানবাধিকার সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তোলা যায়। সেজন্য সর্বধর্মসমন্বয় এবং মানব প্রেমিক ও মানবাধিকার নেতা, দেশের ভিতরের ও বাইরের মহান ব্যক্তিদের জীবনী প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্য বইসমূহে অন্তর্ভুক্ত করে পড়াতে হবে।

যেখানেই এবং যে শ্রেণিতেই সম্ভব কম্পিউটারের সহায়তা নিয়ে পাঠদান, ল্যাবরেটরিতে না-পারা পরীক্ষণ প্রদর্শন, বিজ্ঞানের নানা মডেল জীবন্তভাবে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা ইত্যাদি।

এককথায়, আমরা ৮ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে সত্যিকার অর্থেই উন্নত ও আধুনিকীকরণ করতে চাই, কারণ এই পর্বের শিক্ষণ বিষয় সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন ও একমুখী। আমরা চাই এই পর্বে শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রায় সকল শাখার সাথে পরিচিত হয়ে উঠুক, যাকে ভিত্তি করে সে নিজ চেষ্টায় স্বশিক্ষিত হতে পারে। এর পরের শিক্ষা পর্ব থেকেই বস্তুত শুরু হবে বিশেষায়িত পৃথক পৃথক প্রশস্ত শৃঙ্খলা।

৩.৩.৩ প্রাথমিক পর্বে বর্তমানে চালু অন্যান্য শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ

আমাদের প্রস্তাবিত সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পুরো শিক্ষাক্রমটি গৃহীত হলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, বর্তমানে ভিন্নধারায় পরিচালিত নানা শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ কী হবে? এর একটিই উত্তর হয় যে, এসব ভিন্নপন্থী শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা কার্যক্রমের হবে ক্রম-অবলুপ্তি। যেসব শিক্ষায়তন এ ধরনের শিক্ষাদান করে আসছে, সেসব শিক্ষায়তনকে ক্রমশ সাধারণ ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, প্রতিষ্ঠানের নাম যাই থাকুক।

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম শ্রেণি) সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়াও আরও দুটি প্রাথমিক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু আছে

www.pathagar.com

এর একটি হলো মূলত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষাদান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে ও সমাপ্তি ঘটে প্রাথমিক স্তরে এসে।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো মক্তব-মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, যাকে বলা হয়ে থাকে 'এবতেদায়ি' স্তর। এর আওতায় শিক্ষা চলে পাঁচ বছর মেয়াদি। ভর্তির বয়সসীমা অনির্ধারিত, তবে ছয় থেকে সাত বছরের বালক-বালিকারাই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়।

ক. কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রাথমিক শিক্ষা

জার্মান শব্দ 'Kindergarten'-এর অর্থ হলো শিশুদের উদ্যান বা কানন। সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এসব স্কুলের জনপ্রিয়তা রয়েছে। আদর্শের দিক থেকে কিন্ডারগার্টেন স্কুল অত্যন্ত চমৎকার কনসেপ্ট, কিন্তু আমাদের এখানে এর আদর্শ বজায় রাখতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে এবং এদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়িক।

শিশুকালে ছেলেমেয়েদের উন্মুক্ত পরিবেশে বিশেষ করে প্রকৃতির কোলে কোনো ফুল-ফলশোভিত উদ্যানে শিক্ষাদানের আয়োজন করার যে ধারণা তাকেই কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি শিক্ষাদান বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্ডারগার্টেন ধারণার প্রবক্তা ছিলেন জার্মান দার্শনিক শিক্ষাবিদ ও শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রেডেরিক ফ্রোবেল (Frederich Frobel)। তিনি ১৮৭৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত পরিবেশে একটি উদ্যানে শিশুশিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ফ্রোবেল চেয়েছিলেন খোলা-বাতাসপ্রিয় দুরন্ত শিশুদের শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের আনুষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিয়ে কোনো ফুলবাগানে শিশুদের শিক্ষাদানের একটি স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যেখানে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা লাভ করবে। এই শিক্ষাপদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তিটা হলো উন্মুক্ত বাধা-বন্ধনহীন আবহমণ্ডলে 'শিশুর মন ও দেহের সার্বিক, সর্বাঙ্গীণ ও সাবলীল বিকাশ সাধন।' এই শিশুকাননে শিশুরা নিজহাতে কাজ করবে, আনন্দে গান গাইবে, বাতাসের দোলায় গাছের পাতার ছন্দের সাথে শিশুরা আবৃত্তি করবে কবিতা ও রাইম। শিশুমনচালিত শিশুর এই স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে ফ্রোবেল নাম দিয়েছিলেন শিশুকর্মব্যস্ততা। ফ্রোবেলচালিত এই শিশু শিক্ষাদান পদ্ধতি ইয়োরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমান জনপ্রিয় রূপটি গড়ে ওঠে, যার নাম 'শিশুকানন শিক্ষাদান পদ্ধতি' (Kindergarten System of Education)।

প্রায় একই আদর্শে চালিত হয়ে ফ্রোবেল পদ্ধতিরই সামান্য পরিবর্তন এনে ফরাসি শিক্ষাবিদ মাদাম মেরি মন্তেসরি একটি শিশু শিক্ষাদান পদ্ধতি ফ্রান্সে প্রবর্তন করেছিলেন, যা তারই নামানুসারে মন্তেসরি পদ্ধতি নামে বিশ্বে পরিচিতি

www.pathagar.com

লাভ করে। এই শিক্ষাবিদ রুশোর স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ব্যবহার করেছিলেন শিশুমনে শিক্ষার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে। মন্তেসরি তার শিশু নিকেতনের নাম দিয়েছিলেন 'ক্যাসা দ্য বাম্বিনি' (Casa die Bambini)

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কিন্ডারগার্টেন ও মন্তেসরি পদ্ধতির স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পদ্ধতির মূল আদর্শ ও ধারণাকে অবলীয়ায় ভুলে গিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতারা চার দেওয়ালের মধ্যে 'শিশুবাগান' প্রতিষ্ঠা করতে থাকলেন ব্যবসায়কে সামনে রেখে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এ দুটি মহান আদর্শের ঘটল অপমৃত্যু। আমরা চাই এসব শিশুনিকেতন সত্যিকার অর্থে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল আদর্শে গড়ে উঠুক এবং এই পদ্ধতিতে বাংলাভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান করুক আমাদের প্রস্তাবিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। এর কোনো ব্যত্যয় হলে বাংলাদেশের সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হবে, কথাটি যেন স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে রাখে।

সুতরাং আমরা মনে করি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সরকার কর্তৃক আইনের দ্বারা চালু হলে অন্য কোনো শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা হবে অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় এবং আইনের লঙ্ঘন।

খ. বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে 'এবতেদায়ি' প্রাথমিক শিক্ষা

৮ম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে বর্তমানে চালু 'এবতেদায়ি' শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার কোনো সুযোগ থাকবে না। অন্য সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের মতো এখানেও মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে অনুসরণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম আরবিতে বা বাংলায় যে ভাষাতেই রাখা হোক, শিক্ষা কার্যক্রম হতে হবে অভিন্ন— এর কোনো ব্যত্যয় হওয়া চলবে না। সুতরাং একমুখী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে 'এবতেদায়ি' নামে শিক্ষাপদ্ধতির অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

গ. উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম

আমাদের দেশে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একটি বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে, যা মূলত প্রাথমিক পর্যায়ের। এর মধ্যে বয়স্ক শিক্ষাও আছে। সাধারণত যারা নিয়মিত স্কুলগুলোতে পড়ার সুযোগ বা সময় পায় না, তাদের জন্যই এই শিক্ষা। যদিও এই শিক্ষা এখনো কর্মসূচির পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। এ শিক্ষার প্রাথমিক ফলাফল ইতিবাচক। বেসরকারি সংস্থাগুলোই (সাধারণভাবে এনজিও নামে পরিচিত) উপানুষ্ঠানিক (বয়স্কদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এদের রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলো বেশ চিত্তাকর্ষক এবং এসব পুস্তকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লেখা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। আমাদের প্রস্তাবিত

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা গৃহীত হলে এসব স্কুলকেও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতে হবে, শিক্ষাদান পদ্ধতি ভিন্নতর হলেও।

এখানে উল্লেখ্য যে, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সরকারি কর্মসূচিও আছে। এই শিক্ষার সরকারি নাম উপানুষ্ঠানিক (উপ-আনুষ্ঠানিক) শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির নামে ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে। এই তথাকথিত সাক্ষরতা সমাজে কতটা কল্যাণ বয়ে এনেছে ও অর্থনীতিতে কতটা অবদান রেখেছে, তার একটি নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এবং এই কার্যক্রম নিয়ে নতুন করে ভাববার অবকাশ এসেছে।

৩.৪ মাধ্যমিক : শিক্ষার উদ্দেশ্য

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা তিনটি পর্বে বিভক্ত—

৩ বছর মেয়াদি নিম্ন-মাধ্যমিক : ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত

২ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক : নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং

২ বছর মেয়াদি উচ্চ-মাধ্যমিক : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

আমরা ইতোমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্তমানের নিম্ন-মাধ্যমিককে প্রাথমিক স্তরের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলেছি, এবং এই সুযুক্ত নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম নিয়ে এর আগের পর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা হলো প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী এবং উচ্চতর শিক্ষা পূর্ববর্তী সময়ে অনুসৃত শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষার্থীর জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক অর্থে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বকে প্রান্তিক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই কালপর্বে শিক্ষাগ্রহণ করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা কৈশোর থেকে কৈশোরোত্তীর্ণ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কালটি বয়ঃসন্ধির কাল বলে খুবই স্পর্শকাতর। বয়ঃসন্ধির জটিলতা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়েই আমাদের এই পর্বের শিক্ষা ও পাঠক্রম দাঁড় করাতে হবে।

মূলত নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত ধরে নিয়ে দুটি পর্বে বিভক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার (মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক) সাধারণ উদ্দেশ্যাবলিকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি—

১. প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষাকে আরও সুসংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আগে উল্লিখিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা।

২. এই স্তরের শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্য হলো সমাজ-ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ও উন্নয়নে কুশলী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, যারা হবে

www.pathagar.com

মেধাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ সুনাগরিক এবং যারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

৩. শিক্ষাগ্রহণ যেন শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কেননা জনশক্তির বিকাশ এমন হতে হবে, যাতে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।

৪. শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীকে কর্তব্যবোধে, নৈতিকতায়, মানবতাবোধে উজ্জীবিত সুনাগরিক করে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়।

৫. এছাড়া যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিদ্যাশাখায় ডিগ্রি স্তরে শিক্ষাক্রম গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রস্তুতিপর্ব বলেও অভিহিত করা যায়, যাতে এই স্তরে শিক্ষালাভ করে তাদের মেধার স্ফূরণ ঘটে এবং প্রবণতা অনুযায়ী নিজেদের উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

৬. মাধ্যমিক পর্যায় (৯ম শ্রেণি) থেকে ভোকেশনাল শিক্ষা যুক্ত হবে। সবাইকে ৫০০-৭০০ নম্বরের অভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতে হবে।

৭. আমরা এ প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালে Four Pillars of Education শিরোনামে ইউনেস্কো কর্তৃক সুপারিশকৃত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা স্মরণ করতে পারি—

ক. জানার জন্য শেখা (learning to know)

খ. কিছু করতে পারার জন্য শেখা (learning to do)

গ. নিজেকে বিকশিত করার শিক্ষা (learning to be)

ঘ. সম্প্রীতির মাঝে সকলের সাথে একত্রে বসবাস করতে পারার শিক্ষা (learning to live together)

বস্তুত এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যকেই বোঝানো হয়েছে।

৮. মাধ্যমিক স্তরের শেষ দু'বছরের (১১-১২শ শ্রেণির) শিক্ষাস্তরকে বলা হয় উচ্চ-মাধ্যমিক। এর লক্ষ্য হলো প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তোলা এবং এই স্তরে এসে কেউ যদি শিক্ষা সমাপন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়, সেজন্য তার ভিত্তিটি মজবুত করে গড়ে তোলাও এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩.৫ শিক্ষাক্রম : মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্ব

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর দু'টি—

ক. মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি (Secondary) এবং

খ. উচ্চ-মাধ্যমিক বা Highier Secondary : ২ বছর মেয়াদি

www.pathagar.com

আমরা এখানে মাধ্যমিক পর্বে অনুসরণীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই।

৩.৫.১ মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্বের শিক্ষা ও পাঠক্রম

দুই বছরের (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) এই স্তরে তিন বা ততোধিক বিদ্যাশাখায় শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে তিনটি বিদ্যাশাখা বলবৎ রয়েছে, যেমন কলা বা মানবিক শাখা, বাণিজ্য শাখা ও বিজ্ঞান শাখা। আমরা আরও একটি শাখার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করছি, তা হলো পরিমার্জিত বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষা।

বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি কোর কোর্স অবশ্যই পড়তে হবে।

ক. নবম ও দশম শ্রেণি (দু'বছর মেয়াদি)

সারণি ৩.২ : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পঠনীয় বিষয়বস্তু_কোর কোর্স (সকল শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য)

বিজ্ঞান শাখা	মোট নম্বর	মানবিক ও কলা শাখা	মোট নম্বর	বাণিজ্য শাখা	মোট নম্বর
১. বাংলা	২০০		২০০		২০০
২. ইংরেজি*	১০০		১০০		১০০
৩. গণিত	১০০		১০০		১০০
৪. বিশ্বমানবতা, মানবাধিকার, সেক্যুলারিজম ইত্যাদি	৫০		৫০		৫০
কোর কোর্স (সকলের জন্য)	৪৫০		৪৫০		৪৫০
৫. সমাজ রাষ্ট্র ও সভ্যতার ইতিহাস (Humanities)	৫০	বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিবর্তন	৫০	বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিবর্তন/ সমাজ রাষ্ট্র ও সভ্যতার ইতিহাস	৫০
নির্বাচিত বিষয় (৪টি)	৪০০		৪০০	৪০০	
পদার্থ বিদ্যা	১০০	ইতিহাস	১০০	ব্যবসায় পরিচিতি	১০০
রসায়ন	১০০	ভূগোল	১০০	হিসাব বিজ্ঞান	১০০

* অনেকেই ইংরেজিতে ২০০ নম্বর রাখার কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শাখা	মোট নম্বর	মানবিক ও কলা শাখা	মোট নম্বর	বাণিজ্য শাখা	মোট নম্বর
জীববিজ্ঞান	১০০	অর্থনীতি ও পৌরনীতি	১০০	ব্যবসায় উদ্যোগ/ বাণিজ্যিক ভূগোল	১০০
উচ্চতর গণিত	১০০	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১০০	অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	১০০
বৃত্তিমূলক বিষয় (যেকোনো ১টি)*	১০০		১০০		১০০
মোট	১০০০		১০০০		১০০০
ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোনো ১টি)◆	১০০	ঐচ্ছিক (যেকোনো ১টি)◆	১০০	ঐচ্ছিক (যেকোনো ১টি)◆	১০০
সর্বমোট	১১০০		১১০০		১১০০

* মাধ্যমিক স্তরে সম্ভাব্য বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ

কম্পিউটার শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, বেসিক ট্রেড, গার্মেন্টস ট্রেনিং, বয়ন ও তাঁতশিল্প, রঞ্জন, বাঁশ ও বেতের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, মৃৎশিল্প বা কুমারের কাজ, কামারের কাজ, ধাতব শিল্প, বৈদ্যুতিক কাজ, মেকানিকস, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইলস, কার্পেন্ট্রি, সিরামিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিসিয়ান, মুদ্রণ, কম্পিউটার কম্পোজিশন ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি (স্থানীয়ভাবে কুটির শিল্পের কোনো সুযোগ-সুবিধা থাকলে সে সুযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন)।

◆ বিভিন্ন শৃঙ্খলায় সম্ভাব্য ঐচ্ছিক বিষয়াদি

বিজ্ঞান শাখার জন্য

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার লিটারেসি, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি ও পৌরনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসন বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য-খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি, বাণিজ্যিক ভূগোল, আধুনিক আরবি ভাষা, ইসলাম ধর্ম ও মানবতা, ইসলামিক স্টাডিজ, কোরান ও হাদিস, সংস্কৃত, হিন্দু ধর্ম ও মানবতা, পালি, বৌদ্ধধর্ম ও মানবতা, খ্রিষ্টের বাণী ও মানবতা, উপমহাদেশীয় ভাষা (যেকোনো একটি— হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, অসমিয়া..., বাংলা (অবাঙালিদের জন্য), ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণদের ভাষা (যেকোনো একটি— সাঁওতালি, মণিপুরি, গারো, চাকমা, রাখাইন ইত্যাদি) সংগীত ও নাট্যকলা, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া।

মানবিক ও বাণিজ্যিক শাখার জন্য

সাধারণ বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষিবিদ্যা, তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার লিটারেসি, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য-খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি (basic trade), বাণিজ্যিক ভূগোল, আধুনিক আরবী ভাষা, ইসলাম ধর্ম ও মানবতা, ইসলামিক স্টাডিজ, কোরান ও হাদিস, সংস্কৃত, হিন্দু ধর্ম ও মানবতা, পালি, বৌদ্ধধর্ম ও মানবতা, খ্রিষ্টের বাণী ও মানবতা, উপমহাদেশীয় ভাষা (যেকোনো একটি: হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠা, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, অসমিয়া..., বাংলা (অবাঙালিদের জন্য), ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের ভাষা (যেকোনো একটি : সাঁওতালি, মণিপুরি, গারো, চাকমা, রাখাইন...ইত্যাদি.), সংগীত ও নাট্যকলা, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া...

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : যেসব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে ইসলামি বিষয় বা ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর বিদ্যা অর্জন করতে চান, তারা সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে একটি বিষয় পছন্দ করতে পারে)

www.pathagar.com

খ. কারিগরি-বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক : নবম ও দশম শ্রেণি

বর্তমানে যদিও সাধারণ মাধ্যমিকের সমতুল্য একটি পৃথক বৃত্তিমূলক শাখা রয়েছে, কিন্তু যথোপযুক্ত সুবিধার অবর্তমানে এই শাখাটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। আমরা প্রস্তাব করি যে, সাধারণ ৯ম-১০ম শ্রেণির কোর কোর্সটিকে, অর্থাৎ বাংলা : ২০০, ইংরেজি : ১০০, গণিত : ১০০, বিশ্বমানবতা ও মানবাধিকার: ৫০ ঠিক রেখে এই স্তরের শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সাধারণ মানের শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়। আমাদের প্রস্তাব, এই মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমটিও চার বছর মেয়াদি হবে (৯ম-১০ম এবং ১১-১২শ শ্রেণি)। আমরা সমতুল্য সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক শাখার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির একটি রূপরেখা তুলে ধরলাম—

সারণি ৩.২ক : কারিগরি-বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার পঠনীয় বিষয়বস্তু

বৃত্তিমূলক শাখা	মোট নম্বর	মন্তব্য
১. বাংলা	২০০	
২. ইংরেজি	১০০	অনেকে ইংরেজিতে ২০০ নম্বর করার পক্ষে মত দিয়েছেন
৩. গণিত	১০০	
৪. বিশ্বমানবতা, মানবাধিকার, সেক্যুলারিজম ইত্যাদি	৫০	
কোর কোর্স (সকলের জন্য)	৪৫০	
৫. সমাজ রাষ্ট্র ও সভ্যতার ইতিহাস/ বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিবর্তন	৫০	
বিজ্ঞান বিষয় (৩টি)	৩০০	
পদার্থবিদ্যা (ক) তত্ত্বীয় : ৭৫, (খ) ব্যবহারিক : ২৫	১০০	
রসায়ন (ক) তত্ত্বীয় : ৭৫, (খ) ব্যবহারিক : ২৫	১০০	
উচ্চতর গণিত	১০০	
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় (৩টি)	৩০০	
ফলিত বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিকস	১০০	
ফলিত রসায়ন ও টেক্সটাইল রসায়ন	১০০	

www.pathagar.com

বৃত্তিমূলক শাখা	মোট নম্বর	মন্তব্য
যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics)/ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১০০	
ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)*	১০০	
মোট	১২০০	

৩.৫.২ 'ও-এ' লেভেলভিত্তিক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে 'মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক' স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম

সমাজের উচ্চবিত্তদের ও তথাকথিত অভিজাত কুলীনদের চাহিদার প্রেক্ষিতে অপরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরে এবং এখন ঢাকার বাইরের মফস্বল শহরগুলোতেও চটকদার নাম নিয়ে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসায়িক অর্গানাইজেশেনের উৎপত্তি ঘটেছে। নব্বইয়ের দশক থেকেই এই রমরমা ব্যবসায় দেশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে দেশে দেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল জিসিই মানের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণ করে মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রেড দিয়ে থাকে। এই পরীক্ষা দুটি স্তরে হয়ে থাকে— একটিকে বলা হয় ও লেভেল (Ordinary (O)-level), যা আমাদের এসএসসির তুল্য, আর প্রাগ্রসর স্তরটিকে বলা হয় এ লেভেল (Advanced (A)-Level), আমাদের এইচএসসির সমকক্ষ। এই দু'স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষায় যাতে পরীক্ষার্থীরা ভালো গ্রেড পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর প্রবর্তকরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলে ইয়োরোপ-আমেরিকার নানা নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

---

* সম্ভাব্য ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে একটি বেছে নিতে হবে—

পুরবিদ্যা ও রাজমিস্ত্রির কাজ (civil and masonry), ধাতবশিল্প ও ধাতববিদ্যা (metal industry and metallurgy), পানি ও পানি-সম্পদবিদ্য (hydrology and water resource), স্থাপত্য ও নকশায়ন, কৃষি ও কৃষিযন্ত্রবিদ্যা, টেক্সটাইল কৃৎকৌশল (textile technology), চামড়া কৃৎকৌশল (leather technology), কম্পিউটার শিক্ষা, গার্মেন্টস ট্রেনিং, বয়ন ও তাঁতশিল্প, রঞ্জন, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প বা কুমারের কাজ, কামারের কাজ, মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইলস, কার্পেন্ট্রি, সিরামিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিসিয়ান, মুদ্রণ, কম্পিউটার কম্পোজিশন ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি (স্থানীয়ভাবে কুটিরশিল্পের কোনো সুযোগসুবিধা থাকলে সে সুযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন)।

শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য-খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, অর্থনীতি ও পৌরনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসন বিদ্যা, অর্থনীতি ও পৌরনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি, বাণিজ্যিক ভূগোল, যেকোনো একটি ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি বাদে), সংগীত ও নাট্যকলা, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া।

মন্তব্য : সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক পর্বের পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় আরও উন্নত ও পরবর্তীকালে সুসংহত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

নাম জড়িয়ে বিভিন্ন স্কুলের নামে। এসবের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়া। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান লিমিটেড কোম্পানি নামে সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে একেবারে গ্রেড-১ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করে থাকে। বস্তুত এ সকল প্রতিষ্ঠানকে কোচিং সেন্টার নামে অভিহিত করাই যথাযথ হবে।

আমাদের সামাজিক কোনো চাহিদা এই প্রতিষ্ঠানগুলো মেটাচ্ছে না বা সেই প্রবণতা নিয়ে এগুলোর প্রতিষ্ঠাও হয়নি। এখান থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যই হলো উচ্চশিক্ষার্থে বা চাকরির সন্ধানে যুক্তরাষ্ট্র বা বিদেশে পাড়ি দেওয়া। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়েছে এবং পাঠক্রম বিজ্ঞানভিত্তিক এবং পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক বেশ উন্নত মানের ও চিত্তাকর্ষক।

বলা বাহুল্য, দেশের সমস্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে বা পাঠ্যসূচির সাথে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো যোগাযোগ নেই। দেশীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণের কোনো সুযোগও নেই, কারণ পরীক্ষা দুটি পরিচালিত হয় বিশেষ সিলেবাস অনুসরণ করে, যা প্রণীত হয়েছে বিদেশে।

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে, বলা বাহুল্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে এদের কার্যক্রম পরিচালনার কোনো সুযোগ থাকবে না, কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে চালু রাখতে হলে এসব তথাকথিত স্কুলগুলোকে একমুখী সর্বজনীন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবশ্য অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া আমাদের প্রস্তাবিত সেক্যুলার ও সর্বজনীন একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক, উন্নত এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হলে 'ও' এবং 'এ' লেভেলের শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তাও সমাজের কাছে ফুরিয়ে যাবে।

৩.৬ উচ্চ-মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পর্বের শিক্ষা ও পাঠক্রম

এই শিক্ষাপর্বে দুটি মূলধারার শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে :

প্রথমত : সাধারণ উচ্চ-মাধ্যমিক, যা তিনটি শৃঙ্খলায় বিভক্ত ১. বিজ্ঞান, ২. মানবিক ও কলা, এবং ৩. বাণিজ্য

দ্বিতীয়ত : কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চতর মাধ্যমিক

ক. উচ্চ-মাধ্যমিক (১১-১২শ শ্রেণি)

আমরা আগেই বলেছি এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হলো একদিকে প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে এই

www.pathagar.com

স্তরে কেউ যদি শিক্ষা সমাপন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়, তার ভিত্তিটিও মজবুত করে দেওয়া। আমরা নিচে ছকের ম্যাধ্যমে এই স্তরের পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয়গুলো তুলে ধরছি।

সারণি ৩.৩ : *উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পঠনীয় বিষয়বস্তু*

বিজ্ঞান শাখা	মোট নম্বর	মানবিক ও কলা শাখা	মোট নম্বর	বাণিজ্য শাখা	মোট নম্বর
১. বাংলা	২০০		২০০		২০০
২. ইংরেজি*	১০০		১০০		১০০
৩. মানবতা ও সম-অধিকার : আমাদের লোক ঐতিহ্য♦	৫০		৫০	৫০	৫০
আবশ্যিক বিষয় (৩টি)	৬০০	নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)	৬০০	আবশ্যিক বিষয়	৬০০
৩. গণিত	২০০	৩-৫ নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)[১] প্রতিটি বিষয় : ২০০	মোট ৬০০	অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	২০০
৪. পদার্থবিদ্যা	২০০			হিসাববিজ্ঞান	২০০
৫. রসায়ন	২০০			ব্যবসায় পদ্ধতি ও প্রয়োগ/ ব্যবস্থাপনা	২০০
ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)*	২০০	ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)[২]	২০০	ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)[৩]	২০০

* উচ্চ-মাধ্যমিকেও ইংরেজিতে ২০০ নম্বর রাখার সুপারিশ করেছেন অনেকে।

♦ এই পাঠ্যবিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে সকল মানুষের সমান অধিকার, নারী-পুরুষ সম-অধিকার, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগত জনগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ নারী-পুরুষ সম-অধিকার, ক্ষুদ্র জাতিগত জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি; জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ও নারী অধিকার সনদ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ঘোষণা ও অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি।

* বিজ্ঞান শাখার সম্ভাব্য ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোনো ১টি)

জীববিদ্যা, পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা (Health science & Physiology), চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, নাট্যকলা, সংগীত, আইনবিদ্যা, ভাষা : আরবি/পালি/সংস্কৃত/উচ্চতর বাংলা/উচ্চতর ইংরেজি, চারু ও কারুকলা, আইনবিদ্যা ইত্যাদি।

১. মানবিক শাখার জন্য নৈর্বাচনিক বিষয় (যেকোনো ৩ টি)

অর্থনীতি, গণিত, পৌরনীতি, যুক্তিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান।

২. মানবিক শাখার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় (যেকোনো ১টি)

ক. অর্থনীতি, পৌরনীতি, যুক্তিবিদ্যা, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান। (যে বিষয়টি ইতোমধ্যেই নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে বাছা হয়েছে সেটি বাদে)।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শাখা	মোট নম্বর	মানবিক ও কলা শাখা	মোট নম্বর	বাণিজ্য শাখা	মোট নম্বর
৫. প্রযুক্তি বা বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি)**	১০০		১০০		১০০
মোট	১২৫০		১২৫০		১২৫০

খ. কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক

সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিকের সমতুল্য একটি পৃথক শাখা রাখা প্রয়োজন। যদিও ঢিমেতালে চলা এ ধরনের একটি শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে, অবহেলায় অযত্নে ও যথোপযুক্ত সুবিধার অবর্তমানে এই শাখাটির উন্নয়ন সম্ভব হয় নি। এটিকে মনে করা হয় মিস্ত্রি গড়ার কারখানা। এখানকার শিক্ষার মান এখন পর্যন্ত নিম্ন-পর্যায়ের ও গরিব ঘরের মেধাহীন শিক্ষার্থীরাই এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি হয়।

আমরা প্রস্তাব করি যে সাধারণ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি নিয়ে গঠিত এই স্তরটিকে পরিমার্জন করে উন্নত করে উচ্চ-মাধ্যমিকের অন্য শাখাগুলোর সাথে সমমানে উন্নীত করা। এই পাঠক্রমে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় স্থান পাবে।

খ. উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, পালি, গণিত, পরিসংখ্যান, সমাজকল্যাণ (নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞান পছন্দ করলে এটি নেওয়া যাবে না), ভূগোল, পরিসংখ্যান, কৃষিবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, নাট্যকলা, সংগীত, চারু ও কারুকলা, আইনবিদ্যা ইত্যাদি।

৩. বাণিজ্য শাখার জন্য ঐচ্ছিক বিষয়

গণিত, পরিসংখ্যান, বাণিজ্যিক ভূগোল, বিপণন, কৃষিবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি/ইসলামিক স্টাডিজ, সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ, উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, পালি, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, নাট্যকলা, সংগীত, চারু ও কারুকলা, আইনবিদ্যা ইত্যাদি।

** প্রযুক্তি বা বৃত্তিমূলক বিষয় (যেকোনো ১টি)

কম্পিউটার শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, ব্যবসায় পরিচিতি (basic trade), গার্মেন্টস ট্রেনিং, বয়ন ও তাঁতশিল্প, রঞ্জন, বাঁশ ও বেতের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, মৃৎশিল্প বা কুমারের কাজ, কামারের কাজ, ধাতব শিল্প, বৈদ্যুতিক কাজ, মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইলস, কার্পেন্ট্রি, সিরামিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিশিয়ান, মুদ্রণ, কম্পিউটার কম্পোজিশন ও গ্রাফিক্স, ধাত্রীবিদ্যা, কৃষি ও কৃষিযন্ত্রবিদ্যা, টেক্সটাইল কৃৎকৌশল (textile technology), চামড়া কৃৎকৌশল (leather technology) ইত্যাদি

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে অপশনাল ডিসিপ্লিন হিসেবে সংগীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি থাকতে পারে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি বিভাগে কমপক্ষে একটি কলেজে এগুলো শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষণ সফল প্রমাণিত হলে এই সুযোগ ক্রমাগত প্রসারিত হতে পারে।

www.pathagar.com

বৃত্তি ও প্রযুক্তিমূলক বিষয়গুলোর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করার প্রস্তাব আমরা রাখতে চাই। তবে সম্পূর্ণতার স্বার্থে আমরা এখানে একটি খসড়া পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি।

সারণি ৩.৪ : *কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সম্ভাব্য পাঠ্যসূচি ও নম্বর বিন্যাস*

কারিগরি-বৃত্তিমূলক শাখা	মোট নম্বর	মন্তব্য
১. বাংলা	২০০	
২. ইংরেজি	১০০	অনেকে ইংরেজিতে ২০০ নম্বর করার পক্ষে মত দিয়েছেন
৩. মানবতা ও সম-অধিকার : আমাদের লোক ঐতিহ্য*	৫০	
মোট	৩৫০	
বিজ্ঞান বিষয় (৩টি)	৪৫০	
পদার্থ বিদ্যা	১৫০	
রসায়ন	১৫০	
গণিত	১৫০	
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় (৩টি)■	৩০০	
ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (কোনো শিল্প কারখানায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করা)	১০০	
মোট	১২০০	
ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)♦	৫০	
সর্বমোট	১২৫০	

* এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই মন্তব্য করা হয়েছে।

■ কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পাঠের বিষয় তালিকা

প্রযুক্তি-জ্ঞান, প্রয়োগ ক্ষেত্র ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষণ বিষয়গুলোকে কয়েকটি মোটা দাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন—

ক. কৃষিসংশ্লিষ্ট, খ. প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, গ. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার, ঘ. চামড়াশিল্প প্রযুক্তি, ঙ. টেক্সটাইল প্রযুক্তি, চ. চিকিৎসাসংক্রান্ত প্রযুক্তি, ছ. ললিতকলা, জ. ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়, ঝ. হিসাবরক্ষণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা, ঞ. দাপ্তরিক কার্যাবলিসংক্রান্ত বিষয় (Secretariat & office maintenance), ট. বিবিধ

এই বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের একটি সম্ভাব্য তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

৩.৬.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক অবস্থান

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এখনো সমাজের চোখে সম্মানীয় নয়, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই শিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়নের সুযোগ আমাদের দেশে নেই বলতে গেলে। বরং সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমটিকে এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অবমূল্যায়ন করে ও হেয় চোখে দেখে থাকে। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া শ্রেণির ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত। আমাদের দেশের বিত্তবান ও শাসক শ্রেণি এখনো মনে করেন, উচ্চবিত্ত ও তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির ও উঠতি বেনিয়া-মুৎসুদ্দির ছেলেমেয়েদের জন্য 'সাধারণ ও উচ্চশিক্ষা', আর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেবে গরিব নিম্নবিত্ত কৃষক-শ্রমিকের সন্তান-সন্ততি। দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো, এই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে উৎপাদিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের ধনবানদের কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে চালু রাখবে টেকনিক্যাল দক্ষতা ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান দিয়ে এবং মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সরকার যে উচ্চশিক্ষাকে অনুৎসাহিত করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে থাকে, এর পেছনে কিন্তু এই অসৎ মনোভাবটিও বেশ সক্রিয়। এ কারণেই সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়া শ্রেণি বৃত্তিমূলক-কারিগরি শিক্ষাকে 'উৎপাদনশীল শিক্ষা' নামে প্রচারে অতি উৎসাহী। আমাদের আপত্তিটি এখানেই। সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমকে তাহলে দু'ভাগে ভাগ করতে হয়। ক. উৎপাদনশীল ও খ. অনুৎপাদনশীল। বস্তুত মুক্তবাজার অর্থনীতির অনুসারী পুঁজিবাদী সরকার এবং সরকার যে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে সমাজের সেই বুর্জোয়া বিত্তশালী শ্রেণিটি চায় যে সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা না-নিয়ে অধিকাংশ নিম্নবিত্তের সন্তান-সন্ততি যেন মাধ্যমিক স্তরে বা তার আগে-পরে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করে কাজে লেগে যায়। এ ধরনের শিক্ষাকে তারা 'উৎপাদনশীল শিক্ষা' নাম দিয়ে প্রকৃত শিক্ষার দ্বার সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য রুদ্ধ করে রাখতে চায়। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়ক ও মননশীল শিক্ষা কেবল নিজেদের শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। এ কারণেই শোষক গোষ্ঠী সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বেকার সৃষ্টি করে এই অজুহাত তুলে এই শিক্ষাকে উচ্চমূল্যের পণ্যে রূপান্তরিত করেছে এবং ক্রমশ গরিবের হাতের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে।

আমরা মনে করি, প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল— এ ধরনের কোনো বিভাজন থাকতে পারে না। প্রকৃত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কখনো বেকারত্ব সৃষ্টি করে না, বরং পুঁজিবাদী সমাজের শোষণব্যবস্থা ও জাতির সম্পদকে একটি শ্রেণির মধ্যে আটকে রাখার ব্যবস্থাই কৃত্রিম বেকারত্ব সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

তারপরেও শাসক-শোষক গোষ্ঠী বেকারত্বের দায়টা নিজেদের তৈরি সাধারণ শিক্ষাক্রমের ওপরেই চাপিয়ে দেয় জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের দেশে এই শোষক শ্রেণি কারা? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এই গোষ্ঠীটিকে এভাবে শনাক্ত করেছেন, "...রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী, সিভিল আমলাতন্ত্র এবং মুৎসুদ্দি বণিক পুঁজির 'grand alliance'।"[৬]

আমরা আমাদের কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ। আমাদের প্রস্তাবিত কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম কেবল বেকারত্ব দূর করার প্রয়াস নয়, সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার শিক্ষা কার্যক্রম এবং অন্য উচ্চ-মাধ্যমিক শাখাগুলোর সাথে তুল্য মানের। এটি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা যেন কেবল শোষক গোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ারে পরিণত না হয়— সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এই বিশেষায়িত শাখাটির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় দক্ষ, মননশীলতায় প্রজ্ঞাময়, মুক্তমনের অধিকারী অনুসন্ধিৎসু মানুষ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে সৃষ্টিশীল মানুষ, যার সাথে থাকবে উৎপাদনের হাতিয়ারের নিবিড় সম্পৃক্ততা।

আমাদের কারিগরি শিক্ষায় এবং পুরো শিক্ষাপদ্ধতিতে অবশ্যই ত্রুটি আছে। তাই দেখা যায়, তিন বছর পলিটেকনিকে পড়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পরও শিক্ষার্থীরা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এজন্য কারিগরি শিক্ষার মান নির্ধারণ করতে হবে অবশ্যই সাধারণ শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে। যাতে সকলেই সাধারণ শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে পায়। এ সমস্যা বাণিজ্যিক শিক্ষার বেলাতেও দেখা যায়। আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো যে যেখানেই থাকুক না কেন, তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ যেন কখনোই রুদ্ধ না-হয়ে যায়।

৩.৬.২ সহ-পাঠক্রম/পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মতৎপরতা

সকল শ্রেণিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির বাইরে নানা ধরনের দলগত ও ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ, যাকে বলা হয় Extra/co-curricular activities। বর্তমানে 'Extra curriculam' এর পরিবর্তে 'co-curriculam' কথাটিই শিক্ষার জগতে বেশি চালু।

১. স্কুলে ও স্কুলের বাইরের পাঠাগার ব্যবহার। পাঠ্যসূচির বাইরে নানা ধরনের বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। গ্রন্থই স্বনিয়োজিত শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে;
২. আবৃত্তি, নাটক, সংগীত ও নৃত্যচর্চার চক্র গড়ে তোলা;

www.pathagar.com

৩. দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং ডিবেটিং সোসাইটিতে যোগদান;
৪. সংঘবদ্ধ হয়ে দেওয়াল পত্রিকা ও সংকলন বের করার মধ্য দিয়ে সাহিত্য চর্চার চেষ্টা;
৫. বিজ্ঞান ক্লাব ও বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধিৎসু চক্র গড়ে তোলা এবং এর মধ্য দিয়ে মননশীলতা ও সামাজিক সংশ্লেষণের চর্চা বাড়ানো;
৬. শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়া ও পাড়ায় পাড়ায় অ্যাথলেটিক ও স্পোর্টস ক্লাব গড়ার চেষ্টা। ক্লাব বা গ্রুপ চর্চা শিক্ষায়তন-কেন্দ্রিক হবে এবং তাতে শিক্ষকগণ জড়িত থাকবেন, স্থানীয় সরকারের লোকজন জড়িত থাকবেন।

শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়তন ও শিক্ষকদের নির্দেশনার (instructions) মাধ্যমে অর্জিত হয় না— প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ ও মহৎ মানুষের লেখা আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। আমরা নানা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারি। কেননা সুশিক্ষিত মানেই স্বশিক্ষিত।

৩.৭ উচ্চশিক্ষা

আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা থাকবে। বর্তমানের আলোচনায় আমরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে বাদ রাখছি। উচ্চশিক্ষা শিক্ষাক্রমের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে মোটা দাগে দুটি বিভাগে—

৩.৭.১. সাধারণ উচ্চশিক্ষা

১. ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানের যেকোনো শৃঙ্খলায় উচ্চতম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে অনুশীলন, অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ থাকবে এবং এর মধ্য দিয়ে উচ্চতম ডিগ্রি অর্জিত হবে।
খ. 'মেধার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা দান' এই নীতি সাধারণভাবে গ্রহণীয় হলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না-হয় এ নীতিও সমভাবে প্রযোজ্য। গ. উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মূল লক্ষ্যই হবে ইতোমধ্যে সৃষ্ট জ্ঞান সংরক্ষণ, নতুন জ্ঞান সৃজন আর এর মধ্য দিয়ে জাতি পাবে একটি মেধাবী সৃষ্টিশীল প্রণোদনাময় সুশিক্ষিত সমাজ, যারা দেশকে নানাদিকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।
২. বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাধারণ ডিগ্রি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে, তার অনুপুঙ্খ নিরীক্ষণ ও বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

অবস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। এক কথায়, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কলেজে উচ্চশিক্ষা দানে কেউ সন্তুষ্ট নয়, জনসাধারণ-সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক-অভিভাবক কেউই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলিতে ও ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট নয়।

৩.৭.২ পেশাজীবী প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষা

তথাকথিত পেশাজীবী শিক্ষাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র ভাবি না, এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেবল স্ব স্ব পেশার উপযোগী হিসেবে তৈরি হবে— এটিও আমরা ভাবি না। আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিভাজন কেবল একটি বিশেষায়িত শৃঙ্খলা হিসেবে। এই শিক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেবল একদল সমাজ নিস্পৃহ-নিরাসক্ত প্রকৌশলী, কৃষিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ হয়ে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ যান্ত্রিক স্ব-পেশায় নিয়োজিত যান্ত্রিক মনুষ্যদল সৃষ্টি হবে তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কাম্য নয়। আমরা মনে করি, জ্ঞানে-গুণে, অনুসন্ধিৎসায়, জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় অন্য শৃঙ্খলার উচ্চশিক্ষিত মানুষ থেকে আলাদা নয়। এটি সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় এই শ্রেণির শিক্ষিতজনদের মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলনে, এককথায় সুশীল সমাজের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকায় এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। এ ধরনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা বিশেষ শাখায় জ্ঞান অর্জন করবে ও অর্জন করবে উচ্চতর ডিগ্রি।

আমরা আর একটি কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রকৃত উচ্চশিক্ষা কখনোই অনুৎপাদনশীল বলে বিবেচিত হতে পারে না, বা উচ্চশিক্ষা নিজ থেকে কোনো বেকারত্ব সৃষ্টি করে না, বেকারত্ব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা আর শোষণ। বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে যেসব শৃঙ্খলায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে, তা হলো—

১. বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং;
২. কৃষি বিজ্ঞান;
৩. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান;
৪. আইন, সংসদ ও জন অধিকার;
৫. ললিতকলা;
৬. বিশেষ ধরনের শৃঙ্খলায় শিক্ষা; ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন শ্রেণির উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ শৃঙ্খলার বিশেষ শিক্ষা (পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ও অন্যান্য বিশেষ কারিগরি শিক্ষা...) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বিকল্প ভাবনা

৪. আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই

আমরা বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছি তারই চুম্বক কথাগুলো এখানে 'আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই'— এই শিরোনামের অধীনে উপস্থাপন করেছি। শিক্ষাদর্শনকে সামনে রেখে আমরা স্থির করেছি 'শিক্ষার লক্ষ্য' এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা স্বল্প কথায় নির্ধারণ করেছি—

১. শিক্ষানীতি ও উদ্দেশ্য এবং

২. এর ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা ও সামগ্রিক অবকাঠামো।

উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, এখানে নীতি শব্দটি 'principles' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, পলিসি অর্থে নয়। আমাদের কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যে পন্থা ও কার্যপ্রণালি গ্রহণীয় তাই হলো পলিসি। অর্থাৎ কোন পন্থা ও কার্যপ্রণালি গ্রহণ করে শিক্ষা নামক ধারণাটিকে আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করব, তাকে বলা যেতে পারে 'অ্যাডুকেশন পলিসি' (Education policy)।

শিক্ষানীতি বলতে আমরা বোঝাব শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ও ধারণার প্রকাশ। এখানে বলা ভালো যে শিক্ষা শব্দটি দিয়ে আমরা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয় প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকি। এটি এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা ও শক্তিকে বিকশিত করা ও ফুটিয়ে তোলা যায় এবং জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়। (education is a process by which human beings and societies reach their fullest potential)।

এ কথাগুলোকে সামনে রেখে আমরা প্রস্তাব করেছি যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে— সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার বা লোকায়ত ও একমুখী, যা আমাদের শিক্ষানীতির সারাৎসার

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আমাদের গঠনতন্ত্রে যে সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আমরা স্মরণ করতে চাই— রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পর্বের (২য় পর্ব) ১৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা পলিসির অপরিহার্য শর্ত হলো আমাদের রাষ্ট্রটি হবে সেক্যুলার, উদার, বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক। আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থার যেমন লোকায়তকরণ বা সেক্যুলারাইজেশন চাই, তেমনি চাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থার সেক্যুলারাইজেশন বা লোকায়তকরণ। আর সেক্যুলারাইজেশন বা লোকায়তকরণের মূল ভিত্তিই হলো মানবতাবাদ ও মানবাধিকার, বহুত্ববাদিতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব।

সুতরাং সাধারণভাবে মোটাদাগে আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষার বিষয়গুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে—

- প্রতিবেদনে উচ্চারিত ধারণাগুলোর বাস্তবায়ন, যার সাথে যুক্ত হবে সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা এবং বিভিন্ন শাখায় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ, দক্ষ মানবকর্মী ও কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টি।
- শিক্ষা সম্পৃক্ত হবে—
  ক. সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে
  খ. জীবনবোধ ও জীবনচর্চার সাথে
  গ. উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদনের উপায়ের সাথে
  ঘ. জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসৃষ্টির সাথে
- অন্যদিকে শিক্ষা হবে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসৃষ্টির হাতিয়ার। শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি মুক্তমনা ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত উদার শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি এবং এর পাশাপাশি দক্ষ প্রকৌশলী, কুশলী চিকিৎসক, সৃজনশীল বিজ্ঞানী ও কৃষিবিদ, উদ্ভাবনাময় নানা সুকুমারবৃত্তির শিল্পী, দক্ষ শ্রমিক এবং পরিবেশসচেতন জ্ঞানী কৃষক উৎপাদন।
- নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত দেশে একটিমাত্র সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে, যা হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। এবং শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী (আমাদের সংবিধানের ভাষায় 'একই পদ্ধতির' ও লোকায়ত (সেক্যুলার)। এর ভিত্তিটা হবে বিজ্ঞানমুখী, বিশ্লেষণধর্মী ও মানবতাবাদী। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ প্রশস্ত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। বর্তমানে ৫ম শ্রেণি থেকে একে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যন্ত (৮ম শ্রেণি) প্রসারিত করা ও সবশেষে মাধ্যমিক স্তরকেও (১০ম শ্রেণি পর্যন্ত) এর আওতায় আনতে হবে ধাপে ধাপে। অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য হলো ন্যূনতম শিক্ষার স্তর হবে উচ্চ-

www.pathagar.com

মাধ্যমিক পর্যন্ত (১ম-১২শ শ্রেণি), এবং যা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ উন্নত দেশের মতো ১৮ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় আনা এবং রাষ্ট্রকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।

- বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযুক্ত আয়োজন থাকবে, যাতে কোনো শিক্ষার্থী কোনো পর্যায়ে এসে সাধারণ শিক্ষা চালিয়ে নিতে না-পারলেও যেন তার অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে সাহসের সাথে, এবং সে যেন নিজেকে সমাজের উপযোগী কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে। এককথায়, কোনো স্তরের শিক্ষাই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়— শিক্ষাগ্রহণ যেন হয়ে ওঠে জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার।
- প্রতিটি স্তরের শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যেন পরবর্তী স্তরের জন্য উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার অন্য একটি মূল লক্ষ্য হবে নারী-পুরুষে সমতা, বাংলাদেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সমতা এবং সকল মানুষের সমান অধিকার এই বোধ ও ধারণাকে উজ্জীবিত করা। শিক্ষা কার্যক্রমে, পাঠক্রমে, পাঠ্যসূচিতে, পাঠ্যপুস্তক রচনায় এই বোধ ও ধারণা যেন প্রতিফলিত হয়।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে, তা হলো— পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা যেন এমনভাবে করা হয়, যাতে কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার একটি নিবিড় যোগাযোগ রক্ষিত হয়। যেকোনো কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক যেন শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে বা পলিটেকনিক থেকে পাস করা কোনো প্রকৌশলী যেন উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায়। অথবা কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অথবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার সুযোগ পেতে পারে।

৪.১ সুপারিশমালা

৪.১.১ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক

ক. প্রাক-প্রাথমিক : ৩য় অধ্যায়ে ৩.১ দফায় আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বিশদ আলোচনা ও সুপারিশ করেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হলো না।

খ. প্রাথমিক : প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার হাল-অবস্থাটা দেখে নেওয়া যাক। নিচের ছকে দেশে বিদ্যমান নানা প্রকৃতির প্রাথমিক শিক্ষালয়ের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো—

www.pathagar.com

সারণি ৪.১.ক. *দেশে চলিত বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাথমিক শিক্ষালয়ের অবস্থান*[*]

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষক সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত
সরকারি	৩৭,৬৭১	৪৮.২২	১৬২,০২৯	৫০.৫৪	১০,৮৩০,৭৪২	৬৭:১
বেসরকারি (রেজিঃ)	১৯,৪২৮	২৪.৮৭	৭৭,২৩৩	২৪.০৮	৪,১৬৩,৮৭৩	৫৪:১
বেসরকারি	১,৯৭১	২.৫	৭,৮৮৮	২.৪৬	২৯৯,৩৪৫	৩৮:১
পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৩	০.০৭	২৫৫	০.০৮	১১,৫১৩	৪৫:১
উচ্চ-মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক	১,৫৭৬	২.০২	১০,৫১৫	৩.২৮	৩৩৭,৫২৩	৩২:১
কিন্ডারগার্টেন	২,৪৭৭	৩.১৭	১৫,০৫২	৪.৬৯	৩৬৪,১৯৬	২৪:১
এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক	১৭০	০.২২	৬৭৬	০.২১	২৮,৮৬৪	৪৩:১
কমিউনিটি প্রাথমিক	৩,২৬৮	৪.১৮	৯,১৬২	২.৮৬	৪৯০,৪৫৬	৫৪:১
স্যাটেলাইট (১-২য় শ্রেণি)	৪,০৯৫	৫.২৪	৭,২২৪	২.২৫	২৭৬,৩৪৮	৩৮:১
স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৩,৮৪৩	৪.৯২	১৫,৭৪৪	৪.৯১	৪৩৮,৯৬৭	২৮:১
উচ্চ-মাধ্যমিক সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৩,৫৭৪	৪.৫৭	১৪,৮৫৫	৪.৬৩	৪১৭,৩৮৩	২৮:১
মোট	৭৮,১২৬	১০০	৩২০,৬৯৪	১০০	১৭,৬৫৯,২০০	৫৫:১

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিবরণী অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ—

[*] Primary Education Statistics in Bangladesh. 2001. DPE. Dhaka. May. 2002

www.pathagar.com

সারণি ৪.১.খ : *প্রাথমিক শিক্ষালয়ের অবস্থান**

ধরন	সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (শতকরা)	নারী (শতকরা)	মোট	ছেলে (শতকরা)	মেয়ে (শতকরা)	মোট
সরকারি	৩৭,৬৭১	১০০,১৫৯ (৬১.৭৮)	৬১,৯৫৫ (৩৮.২২)	১৬২,১১৪	৫,৩০৩,২৯ ২ (৪৯.৭৩)	৫,৩৬১,৭৮ ৩ (৫০.২৭)	১০,৬৬৫,০৭৫
বেসরকারি	৪২,১৬২	৯৭,৩৭১ (৫৯.২৮)	৬৬,৮৮৪ (৪০.৭২)	১৬৪,২৫৫	৩,৪৪২,৫৭ ২ (৫০.৬৪)	৩,৩৫৫,৩১ ৪ (৪৯.৩৪)	৬,৭৯৭,৮৮৬
মোট	৭৯,৮৩৩	১৯৭,৫৩০ (৬০.৫২)	১২৮,৮৩৯ (৩৯.৪৮)	৩২৬,৩৬৯	৮,৭৪৫,৮৬ ৪ (৫০.০৮)	৮,৭১৭,০৯ ৭ (৪৯.৯২)	১৭,৪৬২,৯৬১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে গড়ে ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৬১ জন আর নারী শিক্ষক ৩৯ জন। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত—

১. সরকারি প্রাথমিক : ৬৬ : ১

২. বেসরকারি প্রাথমিক : ৪১ : ১

মোট : ৫৪ : ১

দেখা যাচ্ছে, গড়ে প্রতি ৫৪ জন ছাত্রের জন্য রয়েছেন ১ জন শিক্ষক। সরকারি ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরও বড়।

চিত্র ৪.১ : *বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাথমিক স্কুলের বণ্টন বিন্যাস*

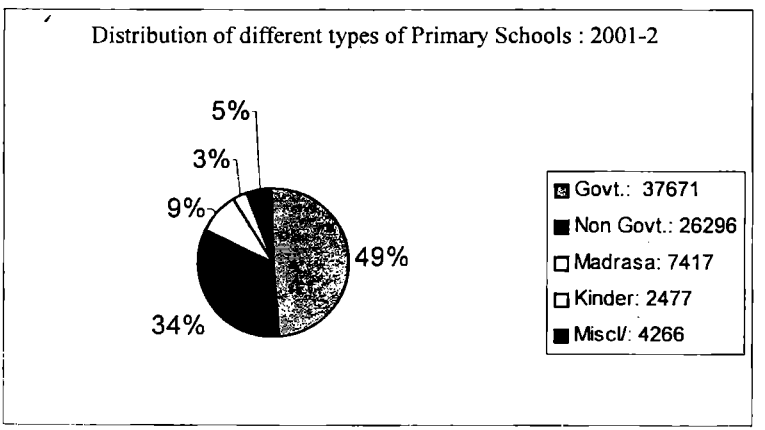

* শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট : http://www.moedu.gov.bd/

www.pathagar.com

চিত্র ৪.২ : *বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত শিক্ষার্থীদের বণ্টন বিন্যাস*

Distribution of Primary level sturents at different types of institutions 2001

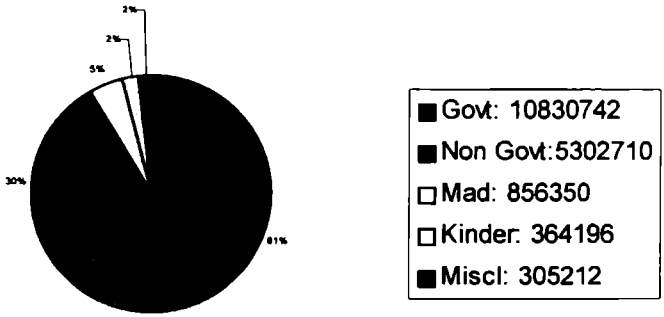

অন্য একটি সূত্র থেকে দেখা যায়, ২০০৪ সালে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে অনুমোদিত শিক্ষক সংখ্যা ১৮০,০৮৮ জন, এর মধ্যে ১৭,১৭৮টি পদ শূন্য রয়েছে। নারী শিক্ষকের সংখ্যা ৬৬,৭২৫ (৩৭%) জন, আর পুরুষ শিক্ষক ১৬২,২২০ (৬৩%) জন।*

দেশের ও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। সেগুলো হলো—

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি : বিশ্বে যে হারে ও দ্রুততায় জ্ঞানবিজ্ঞান কারিগরি কৃৎকৌশল এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও সম্প্রারণ ঘটছে, তাতে প্রাথমিক শিক্ষাকে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে আটকে রাখলে সেই শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন ও যুগের দাবি মেটাতে পারবে না। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বর্তমান ৫ বছর থেকে ৮ বছর মেয়াদে উত্তীর্ণ করা দরকার— অর্থাৎ এই শিক্ষা স্তরের আওতায় আসবে ১ম-৮ম শ্রেণি (৬-১৪ বছর বয়স) পর্যন্ত। তবেই এই স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অবদান রাখতে পারবে; এবং এই শিক্ষাক্রম হবে সর্বজনীন। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার উদ্যোগ নেওয়া অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশকে আমরা কালোপযোগী বলে মনে করি (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)।

---

* BANBEIS (Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics), 2004

www.pathagar.com

২. আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাক্রম হবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী একই পদ্ধতির গণমুখী, সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

আমাদের সবচেয়ে আশু কর্তব্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ করা ও দ্রুত জনগণের কাছে নিয়ে আসা। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার উপযোগী সকল বালক-বালিকাকে স্কুলে পৌঁছানো সমাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এখানেই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়াস দিতে হবে। শুধু নিয়ে আসাই নয়, তারা যাতে টিকে থাকে এবং গুণগত শিক্ষা পায় সেদিকেও নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে কয়েকটি বড় সমস্যা হলো—

১. প্রাথমিক শিক্ষার মান মোটেই আশানুরূপ নয়। এমন উদাহরণ আছে, যেখানে পাঁচ বছর পড়েও অক্ষরহীন রয়েছে, সংখ্যা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ এমন শিক্ষার্থীরও হদিশ মেলে। আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাবও রয়েছে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে হবে। এজন্য সদা সতর্ক মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রাখাও অবশ্য প্রয়োজন।

২. ঝরে পড়া একটি বড় সমস্যা। নানাবিধ কারণে এটি ঘটছে— আমাদের তা অতিক্রম করতে হবে। ১৯৯৮ সালের একটি জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমন শিশুর সংখ্যা ৭৭%। এর অর্থ হলো ওই সালে ৬-১০ বছরের শিশুদের মধ্যে ২৩ শতাংশ স্কুলে আসতে পারেনি। ১৯৯৯ সালে ঝরে পড়ার সংখ্যা ৩০ শতাংশের মতো কমে আসলেও এই সংখ্যা বিপজ্জনক এখনো। প্রায় ৩৮-৪০ শতাংশ শিশু একই শ্রেণিতে থেকে যায়। ঝরে পড়ার সংখ্যা কিন্তু মেয়েশিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি। এই প্রবণতা রোধ করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার ইতোমধ্যেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথে প্রত্যাবর্তনে কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানা যায়।

৩. সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে মেয়েদের জন্য এখনো রয়েছে স্কুলে আসা-যাওয়ার সমস্যা। (ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানি, পথ থেকে হরণ গ্রামাঞ্চলে একটি পরিচিত সমস্যা...)। সরকারি উদ্যোগ, গণমাধ্যমের ব্যবহার, এনজিও সংস্থা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই সমস্যার অনেকটাই দূর করা যেতে পারে।

শিশুর সৃষ্টিশীল মনের বিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক স্তরে অনুসরণীয় পাঠক্রমের সাথে সহপাঠক্রমকে আমরা অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব করেছি। সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় কার্যাবলির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। এর সাথে আরও দু-একটি কার্যক্রমের কথা ভাবা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১. মানসিক ধীশক্তি ও চিন্তনক্ষমতা বৃদ্ধির (growth of mental faculty and emotional growth) লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ, সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে।

২. সামাজিক নীতিবোধ সম্পর্কে শিক্ষণ, নিজের ও অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা এবং ভালোমন্দ সম্পর্কে তাদের জানানো।

৩. স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক জ্ঞান : প্রতিটি শিশুকে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানানো, নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে মৌলিক কাজগুলো করতে পারার শিক্ষাদান (যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হস্তমুখ প্রক্ষালনসহ প্রাত্যহিক কর্মাদি সম্পাদন, পোশাক পরিচ্ছদ ধৌতকরণ, বিশুদ্ধ পানি পান, ধোঁয়াশাময় পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি)। শিশুকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হতে শেখানো।

৪. 'তিন আর (৩জ)'-এর জ্ঞান অবশ্যই শিশুকে দিতে হবে, যা কেবল বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্য আবশ্যক নয়, শিশুর জীবনেও প্রয়োজন। শিশু এ বয়সে চাইবে নিজেকে প্রকাশ করতে কথোপকথন ও পড়া আর লেখার মধ্য দিয়ে। তার কী আছে এবং অন্যের কী আছে সে হিসেব করতে চাইবে।

৪.১.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যাগত অবস্থান কেমন। নিচের ছকে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানো হলো।

www.pathagar.com

সারণি : ৪.২.ক *মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য*[*]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
মাধ্যমিক স্কুল (দশম শ্রেণি)		পুরুষ (শতকরা)	নারী (শতকরা)	মোট	পুরুষ (শতকরা)	নারী (শতকরা)	মোট (শতকরা)
সরকারি মাধ্যমিক স্কুল	৩১৭	৪,৮২৫ (৬৫.৮৯)	২,৪৯৮ (৩৪.১১)	৭,৩২৩ (১০০)	১১৮,৬১৯ (৫৩.২৫)	১০৪,১২১ (৪৬.৭৫)	২২২,৭৪০ (১০০)
বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল	১৩,০৮৭	১৩৯,৩৩৬ (৮১.৫৪)	৩১,৫৫১ (১৮.৪৬)	১৭০,৮৮৭ (১০০)	৩৩১১২৩৬ (৪৭.৫৭)	৩৬৪৯৫১৭ (৫২.৪৩)	৬,৯৬০,৭৫৩ (১০০)
মোট	১৩,৪০৪	১৪৪,১৬১ (৮০.৮৯)	৩৪,০৪৯ (১৯.১১)	১৭৮,২১০ (১০০)	৩৪২৯৮৭৫ (৪৭.৭৫)	৩৭৫৩৫৩৮ (৫২.২৫)	৭১৮৩৪৯৩ (১০০)
দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরে গড়ে প্রতি ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৮১ জন, আর নারী শিক্ষক ১৯ জন। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত : ৪০.৩।							
বেসরকারি স্কুল ও কলেজ	২১৯	২,৫৮৩ (৭৪.০১)	৯০৭ (২৫.৯৯)	৩,৪৯০ (১০০)	১৯,৭৬৫ (৪৫.০৭)	২৪,০৯১ (৫৪.৯৩)	৪৩,৮৫৬ (১০০)
দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে গড়ে প্রতি ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৭৪ জন, আর নারী শিক্ষক ২৬ জন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ২২ : ১৯। মোটামুটি প্রতি ২২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক।							
ক্যাডেট কলেজ	১০	২৬৩ (৮৪.৮৪)	৪৭ (১৫.১৬)	৩১০ (১০০)	২,৪৩৫ (৮৯.১৯)	২৯৫ (১০.৮১)	২,৭৩০ (১০০)
দেখা যাচ্ছে, ক্যাডেট কলেজগুলোতে গড়ে প্রতি ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৮৫ জন, আর নারী শিক্ষক ১৫ জন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৮ : ৮১। মোটামুটি প্রতি ৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক।							
বৃত্তিমূলক এসএসসি স্কুল (বেসরকারি)	১,১৮৬	৩,০৩০ (৮৮.৬০)	৯২০ (১১.৪০)	৩,৪২০ (১০০)	৫৩,৫৬৫ (৬৮.০০)	২৫,২০৭ (৩২)	৭৮,৭৭২ (১০০)
দেখা যাচ্ছে, বৃত্তিমূলক (এসএসসি) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গড়ে প্রতি ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৮৯ জন, আর নারী শিক্ষক ১১ জন। আর এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ২৩ : ০৩, মোটামুটি প্রতি ২৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক।							
এইচএসসি(ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) ইনস্টিটিউট	৮২৮	২৮৫৪ (৮৩.৪৫)	৫৬৬ (১৬.৫৫)	৩,৪২০ (১০০)	৩৪,২৫৫ (৭২.১৩)	১৩২,৩৩ (২৭.৮৭)	৪৭,৪৮৮ (১০০)
প্রতি ১০০ জন শিক্ষকে নারী শিক্ষক মাত্র ১৭ জন। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ১৪।							

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত

[*] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

www.pathagar.com

সরকারি মাধ্যমিক স্কুল	৭,৩২৩	২২২,৭৪০	৩০.৪২
বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল	১৭০,৮৮৭	৬,৯৬০,৭৫৩	৪০.৭৩
মোট	১৭৮,২১০	৭,১৮৩,৪৯৩	৪০.৩১

দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরে প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক। অন্যদিকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি)

বেসরকারি নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
	৩৯৮২	২২৮১৬ (৮০.৪৯)	৫,৫৩১ (১৯.৫১)	২৮,৩৪৭	৩৭৩,৯৪২ (৩৯.৬৬)	৫৬৮,৯২৭ (৬০.৩৪)	৯৪২,৮৬৯ (১০০)
মোট	৩৯৮২	২২৮১৬ (৮০.৪৯)	৫,৫৩১ (১৯.৫১)	২৮,৩৪৭	৩৭৩,৯৪২ (৩৯.৬৬)	৫৬৮,৯২৭ (৬০.৩৪)	৯৪২,৮৬৯ (১০০)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে গড়ে প্রতি ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ৮০ জন, আর নারী শিক্ষক ২০ জন।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী:শিক্ষক অনুপাত

নিম্ন মাধ্যমিক	মোট শিক্ষক	মোট শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত
বেসরকারি নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল	২৮,৩৪৭	৯৪২,৮৬৯	৩৩ : ২৬

দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরে প্রতি ৩৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক।

উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের অবস্থানটি নিচের ছকে দেখানো হলো–

সারণি ৪.২খ : *উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য*

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)		পুরুষ (শতকরা)	নারী (শতকরা)	মোট	ছেলে (শতকরা)	মেয়ে (শতকরা)	মোট
সরকারি	১০	৮৮ (৬৫.৮৯)	৬৫ (৩৪.১১)	১৫৩	৩৫৭৯ (৫৩.২৫)	৩১৪২ (৪৬.৭৫)	৬৭২১
বেসরকারি	১৩৫০	২০,৭৭১ (৮১.২২)	৪৮০৩ (১৮.৭৮)	২৫,৫৭৪	১৪৮,১৩৭ (৫৩.৫৪)	১২৮,৫২৪ (৪৬.৬৪)	২৭৬, ৬৬১
মোট	১৩৬০	২০,৮৫৯ (৮১.০৮)	৪,৮৬৮ (১৮.৯২)	২৫,৭২৭	১৫১,৭১৬ (৫৩.৫৪)	১৩১,৬৬৬ (৪৬.৪৬)	২৮৩, ৩৮২

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে যে প্রকট সমস্যাগুলো রয়েছে তা মোটামুটি এভাবে চিহ্নিত করা যায়—

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার বড় সমস্যা হলো এতে অনুত্তীর্ণের বিপজ্জনক সংখ্যা। এ পর্যায়ে ৬০-৭০% পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়, যা জাতির জন্য লজ্জাজনক। অথচ আমরা আশা করব ১০০% কৃতকার্যতার। উদাহরণস্বরূপ

www.pathagar.com

২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার আশংকাজনকভাবে নেমে এসেছিল (দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি)। নিচের দেওয়া ছক থেকে গত কয়েক বছরের ফলাফল থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অবশ্য গত বছর থেকে কিছু কিছু উন্নতি লক্ষণীয়।*

সারণি ৪.২.গ : *মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল (১৯৯৯-২০০৩)*

পরীক্ষা বছর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট পাসের সংখ্য		পাসের শতকরা হার (%)	
	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে
১৯৯৯	৮৩৭২২০	৩৬২৮৭৫	৪৫৭২৫২	১৯৪৪৮৫	৫৪.৬২	৫৩.৬০
২০০১	৭৮৬২২০	৩৩৪২৫৫	২৭৬৯০৩	১১২৮৬৮	৩৫.২২	৩৩.৭৭
২০০২	১০০৫৯৩৭	৪৪১০২৪	৪০৮৯৬৯	১৬৬৩৩৯	৪০.৬৬	৩৭.৭২
২০০৩	৯২১০২৪	৪০৯৬২৩	৩৩০৭৭৬	১৩৭৬৪০	৩৫.৯১	৩৩.৬০

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মানই শুধু নিম্নগামী নয়, শিক্ষার প্রশাসনিক জগতে কী ধরনের অরাজকতা চলছে এই ফলাফল তারই স্পষ্ট ঘোষণা।

২. পাস করা ছেলেমেয়েদের পরবর্তী স্তরে ভর্তি হতে না-পারা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ না-পাওয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি, যার সমাধান আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। প্রস্তাবিত শিক্ষা কার্যক্রমে একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার যত বাড়বে, ফলাফল ভালো হবে, ভর্তি সমস্যা ততই প্রকটতর হবে। এ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ভালো ফল করেও ভর্তি-পরীক্ষার সুযোগ না-থাকায় অনেক শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষালয়ে ভর্তি হতে পারেনি।

৩. উচ্চ-মাধ্যমিকে যারা পাস করছে তাদের গড় মান মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়, যদিও জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তারা উপযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে না। শিক্ষাগত মান উন্নত করতে হলে চাই ভালো শিক্ষক, ভালো পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা এবং ভালো পাঠ্যপুস্তক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ইত্যাদি। গ্রামে এই সমস্যাগুলো আরও প্রকট।

---

*এ বছর (২০০৬) হঠাৎ করে পাসের হার দু'টি মাধ্যমিক পরীক্ষাতেই জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার দেশের ৭টি বোর্ড থেকে মোট পরীক্ষার্থী ৪,১৮,৮৮৩ জনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল ৪,১২,০২৪ জন। সর্বমোট পাস করেছে ২,৬৩,৩৫৮ জন। গড় পাসের হার ৬৩.৯২%। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ ৭৪.৭৬% এবং সর্বনিম্ন রাজশাহী বোর্ডে ৫৬.৭৬ %। মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,০৮,৯৬৯ জন। ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর পাসের হার হলো যথাক্রমে ৬৪.৮৩% ও ৬৩.৫৩%। এবার এই হার ছিল ৬০.৮৩% ও ৫৮.১২%। জিপিও-৫ পেয়েছে ৯,৪৫০ জন, যা গত কয়েক বছরের সংখ্যাকে বিপুলভাবে অতিক্রম করে গেছে। এর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৮২৯ জন। উচ্চ-মাধ্যমিকের ফলাফলে এই হঠাৎ বৃদ্ধি মান নিয়ে নানা প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে খাতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও মান সম্পর্কে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে পাসের হার বাড়লে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাপ বাড়তে থাকবে। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, বর্তমানে উচ্চ-মাধমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাত্র ৪% পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারে— এই হার বর্তমান থাকলে আগামী বিশ বছরে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারা ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়াবে মোটামুটি ১৮৪,৫৪৭ জন। আর পাস করা ছাত্রের ১২% উচ্চশিক্ষায় আসতে পারলে সংখ্যাটি হবে ২২১,৪৫৬ এবং ১৫% উচ্চশিক্ষায় এলে সংখ্যাটি হবে ২৭৬,৮২০ জন। এজন্য আগামী বিশ বছরে আমাদের প্রয়োজন হবে ২৮টি অতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় যেতে পারে উচ্চ-মাধমিক পাস ছাত্রের মাত্র ৪%, পক্ষান্তরে ভারতে এই সংখ্যা ১২%, মালয়েশিয়ায় ২৯%, আর থাইল্যান্ডে ৩৭%। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, গত শিক্ষাবর্ষের (২০০৪-২০০৫) দশ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বর্তমানে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে।[৭]

সারণি ৪.৩ : *উচ্চশিক্ষায় পাঠরত শিক্ষার্থী (২০০৪-২০০৫)*

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শতকরা হিসেব
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	১১২,৪৩০	১০.৯
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কলেজসমূহ	৭৭৩,৪৯২	৭৪.৯
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৮৪,২৭১	৮.১
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়	৬২,৮৫৬	৬.১
সর্বমোট	১,০৩৩,০৪৯	১০০
এর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটামুটি ৩৩%		

৪. সমাজের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধানের কারণে শিক্ষা হয়ে পড়েছে পণ্য এবং বিত্তবানদের হাতে বন্দী। যার অর্থ আছে, সে-ই এটি কিনতে পারে। গ্রাম ও শহরের স্কুলের মধ্যে অসীম ব্যবধানের ফলে দুই শ্রেণির মানসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ তৈরি হচ্ছে।

৫. ঝরে পড়া আর একটি বড় সমস্যা। ১৯৯৯ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্বে ও মাধ্যমিক পর্বে ঝরে পড়ার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১%, ৫২%। ব্যানবেইসের একটি হিসেব অনুযায়ী ২০০২ সালে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৪৬.৫% আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৩.৫%। ১৯৯৮ সালে মেয়েশিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৫১.২%। গড়ে বৃদ্ধি ঘটেছে মেয়েদের ক্ষেত্রে ২৫.৯%, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে নেমে এসেছে ১৫%। মেয়েদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ, কিন্তু আবার আশংকার কথা ছেলেদের জন্য। তবে কি বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেদের অল্প বয়সেই অন্যত্র ব্যবহার করছে স্কুলে

www.pathagar.com

না-পাঠিয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধির স্বার্থে। উপবৃত্তি প্রথা চালু হওয়াতে মেয়েভর্তির প্রবণতা বেড়েছে। তবে প্রশ্ন হলো মা-বাবারা কতটা মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহে আর কতটা মেয়ের বৃত্তির টাকার আকর্ষণে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত ও জটিল সমস্যা হলো 'ধরে রাখা'। যতই ওপরে উঠা যায় মধ্যপথে ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা সমাধানকল্পে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগও নিতে হবে।

৬. মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিপুলসংখ্যক অকৃতকার্যতা আমাদের এই স্তরের শিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একটি বিপুল প্রচেষ্টা ও বাস্তবমুখী কর্মসূচিই কেবল তাৎপর্যময় পজিটিভ পরিবর্তন আনতে পারে। আবার একই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গণহারে পাসের হার বৃদ্ধি সমস্যাকে আরও জটিল করবে এবং শিক্ষার গুণগত মানকে নামিয়ে আনবে।

৭. সর্বস্তরে (প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা) শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা বাংলা, তবে ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের জন্য প্রথম দিকে (অন্তত তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত) তাদের মাতৃভাষায় (যদি সে ভাষা শিক্ষাদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

৮. শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নারী-পুরুষ সমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন এই বোধ জাগিয়ে তোলা। এছাড়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান— এই বোধ সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তোলা।

৯. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানবাধিকারসহ সকল আন্তর্জাতিক সমানাধিকারের সাথে তৎসংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে জানানো ও এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

১০. উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে আরও কিছু বিশেষ শৃঙ্খলা প্রবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে, যেমন ললিতকলা, নাট্য ও সংগীত, নীতিশিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি।

৪.১.৩ নীতিশিক্ষা

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই মনে করেন যে শিশুদের চরিত্র গঠনের জন্য ও ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা অর্জনের জন্য, বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিনয়ী হওয়া, সত্যনিষ্ঠ হওয়া— এসব গুণাবলি অর্জন করতে হলে শিশুপাঠের বয়সকালে কোনো-না-কোনো স্তরে শিশুদের নীতিশিক্ষা দান অবশ্য প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন এ কাজটি ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন সম্ভব।

www.pathagar.com

এজন্যই এ মতাবলম্বীরা প্রাথমিক পর্ব থেকেই সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে থাকেন। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এ মতটি গৃহীত হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্ম আবশ্যিক পাঠ হিসেবে কারিকুলামে স্থান পেয়েছে।

আমরা অবশ্য মনে করি না যে, নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সহ-সম্পর্কিত বা পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের প্রস্তাব হলো যে, বিশেষ কোনো ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত না-করে নীতিশিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং উচিত।

আমরা ইতোমধ্যেই নীতিশিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব রেখেছি। নীতিশিক্ষার সারকথা হলো ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে তোলা। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি শব্দগুলোর তাৎপর্য গল্প, কথা ও উদাহরণের মাধ্যমে শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া। অনেকটা 'ঈশপের গল্প', পঞ্চতন্ত্র, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বা ঠাকুরমার ঝুলির মতো করে গল্পের মাধ্যমে শিশুকে নীতিশিক্ষা দিতে হবে।

নীতিশিক্ষা দান প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত উঠে এসেছে নানা মতবিনিময় অনুষ্ঠানে। বেশির ভাগই মতপ্রকাশ করেছেন নীতিশিক্ষা প্রাথমিক পর্বে ধর্মকে বাদ দিয়ে রাখার জন্য। আমরা এ নিয়ে 'মতামত প্রসঙ্গ' আলোচনায় এ প্রসঙ্গে আবারও ফিরে আসব। (পরিশিষ্ট-৮)

ধর্ম ও নীতি শিক্ষা নামে জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে খোলার চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। এর অধীনে ধর্মতত্ত্ব ও শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী কোনো বিশেষ ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক নানা শাখায় পড়াশোনা করার সুযোগ থাকবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে পরিশিষ্ট-১১-এ।

৪.১.৪ মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সমাজ জীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এক শ্রেণির মানুষের কাছে এ শিক্ষাপদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যদিও সকলেই স্বীকার করেন যে এই শিক্ষাপদ্ধতি বৃহত্তর অর্থে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে লক্ষণীয় অবদান রাখছে না। বেশ কয়েক বছর ধরে আধুনিকীকরণের নামে বিপুল অর্থব্যয় (বেসরকারি মাদ্রাসা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ শিক্ষা বাজেটের মোট বরাদ্দের ২২%) করেও বড় বেশি সাফল্য অর্জন করা যায় নি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন এবং আমাদের প্রস্তাবিত লোকায়ত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের কী হাল তা চট করে দেখে নেওয়া যাক। আমরা ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে তৎকালে ৪৫টি কামিল, ৩০০টি ফাজিল, ৩০২টি আলিম এবং ৭৬৫টি দাখিল মাদ্রাসাসহ মোট মাদ্রাসা শিক্ষায়তন ছিল ১,৪১২টি। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ।[৮]

২০০৩ সালে বিএনপি সরকার প্রণীত প্রতিবেদনে অবস্থা দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ[৯] :

সারণি ৪.৪ক : *মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (২০০৩)*

মাদ্রাসার ধরন	সংখ্যা (২০০৩)	১৯৯৯-এ সংখ্যা	১৯৭৪-এ সংখ্যা	বৃদ্ধির হার প্রতিবছরে %
এবতেদায়ি	১৮,২৬৮	১০,০০০*	-	২০.৬৭ (৪ বছরে)
দাখিল	৯,২০৬	৪,৮৬৫	৭৬৫	৩৮.০৫ (২৯ বছরে)
আলিম	১,১৮০	১,০৯০	৩০২	১০.০৩ (২৯ বছরে)
ফাজিল	১,১৮০	১,০০০ (৩)	৩০০	১০.১২ (২৯ বছরে)
কামিল	১৮০	১৪১ (৩)	৪৫	১০.৩৫ (২৯ বছরে)
মোট	৩০,০১৪	১৭,০৬৯	১,৪১২	

১. ১৯৭৪-২০০৩ সাল পর্যন্ত ২৯ বছরে দাখিল-কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৭৪৬। অর্থাৎ প্রতি বছরে শতকরা বৃদ্ধির হার ২৮.৭%।

২. আর ১৯৯৯-২০০৩ এই চার বছরে স্বতন্ত্র এবতেদায়িসহ মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০,০১৪। অর্থাৎ প্রতি বছরে শতকরা বৃদ্ধির হার ১৯%।

৩. বন্ধনীর সংখ্যাটি সরকার পরিচালিত মাদ্রাসা নির্দেশ করে। এ থেকে অনেকে মনে করতে পারেন যে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষায় অনুৎসাহী, কিন্তু বাস্তবে চিত্রটি বিপরীত।

চিত্র ৪.৩ : *এবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি (১৯৪৯-২০০৩)*

Growth of Madrasa Primany (ebtedayi) students enrolemnt over the years

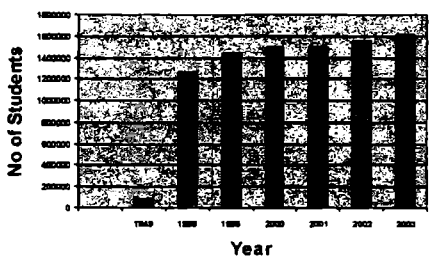

* দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিবেদন অনুযায়ী (৯ জুলাই, ১৯৯৯)। অন্য একটি সূত্রমতে এই সংখ্যা ৯,৫৬১।

www.pathagar.com

এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী বৃদ্ধির প্রকৃতি কী ধরনের তা দেখা যাক। ১৯৭৪ সালে খুদা কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে মাদ্রাসায় পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখের মতো, আর ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৫৭১,৭৭৬। ১৯৭৪-১৯৯৯ সময়ে ২৫ বছরে প্রতি বছর শতকরা হিসেবে শিক্ষার্থী সংখ্য বেড়েছে ১১.৭২% হারে।

বেনবেইসের একটি জরিপ থেকে ১৯৯৩-১৯৯৯ এই ছয় বছরে মাদ্রাসার কোন স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা কী হারে বাড়ছে, তার একটি চিত্র পাওয়া যায় :

সারণি ৪.৪খ : *মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির প্রকৃতি (১৯৯৩-১৯৯৯)*

মাদ্রাসার রকম	মাদ্রাসার সংখ্যা		শিক্ষার্থীর সংখ্যা		৬ বছরে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার (%)	গড়ে প্রতি বছরে বৃদ্ধির হার (%)
সাল	১৯৯৩	১৯৯৯	১৯৯৩	১৯৯৯		
দাখিল	৩,৮২৫	৪,৮৬৫	৪৫৮,০৯৩	৮৫৫,৪৮৮	৮৬.৭৫	১৪.৪৬
আলিম	৮০৭	১,০৯০	১২৪,৫৩৩	২৮৬,৪৯১	১৩০	২১.৬৮
ফাজিল	৮৩১	১০০০	১৭২,৯৯৫	৩৪৭,৪৮৩	১০০.৮৬	১৬.৮১
কামিল	১০০	১৪১	৩৭,৯২০	৮২,৩১৪	১১৭.০৭	১৯.৫১
মোট	৫,৫৬৩	৭,০৯৬	৭৯৩,৫৪১	১,৫৭১,৭৭৬	৯৮.০৭	১৬.৩৪

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে ক্রমশ আসন পাকাপোক্ত করে ফেলছে। দেশে কোনো সরকারি এবতেদায়ি মাদ্রাসা নেই। এই প্রাথমিক পর্যায়ের মাদ্রসাগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা দেড় লক্ষাধিক, অধিকাংশেরই কোনো শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেই। শিক্ষকদের গুণগত মানও কাঙ্ক্ষিত মানের অনেক নিচে, ফলে শিক্ষার মানও আশানুরূপ হতে পারে না। এভাবে শিক্ষাদান অশিক্ষাকেই প্রশ্রয় দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টিকালে অর্থাৎ ১৯৪৮-'৪৯ সালে প্রায় ৫৭ বছর আগে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা ও পাঠরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কী ছিল নিচের ছকটিতে তা তুলে ধরা হলো—

www.pathagar.com

সারণি ৪.৪গ : *১৯৪৮-'৪৯ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান*

মাদ্রাসার প্রকৃতি	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
১. হাই মাদ্রাসা (নতুন)		
সরকারি	৩	৭৯৬
বেসরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত	৫৯	১১,০৬৮
বেসরকারি	২	৩৩১
মোট	৬৪	১২,১৯৫
২. জুনিয়র মাদ্রাসা (নতুন)		
সরকারি	১	২৬০
বেসরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত	৮৩৭	৭৯,০৩১
মাদ্রাসার প্রকৃতি	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
বেসরকারি	৫৮	৪,০১৩
মোট	৮৯৬	৮৩,৩০৪
৩. সিনিয়র মাদ্রাসা (পুরাতন)		
সরকারি	২	৩৫৯
বেসরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত	১৯০	২২,৯২১
বেসরকারি	৪১	৫,৭০৬
মোট	২৩৩	২৮,৯৮৬
৪. জুনিয়র মাদ্রাসা (পুরাতন)		
সরকারি	শূন্য	শূন্য
বেসরকারি-অনুদানপ্রাপ্ত	১১৯	৬,৫০১
বেসরকারি	৪৯	৩,৮৮৬
মোট	১৬৮	১০,৩৮৭
সর্বমোট	১,৩৬১	১৩৪,৮৭২

www.pathagar.com

চিত্র ৪.৪ক : *দাখিল-কামিল মাদ্রাসার বৃদ্ধি (১৯৪৯-২০০১)*

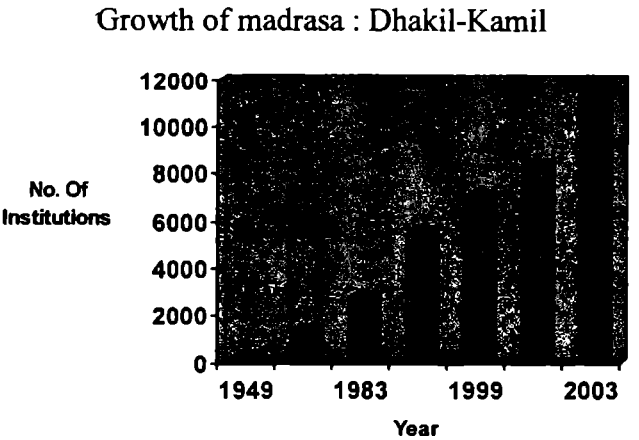

৪.৪ খ : *শিক্ষার্থী বৃদ্ধি (১৯৪৯-২০০১)*

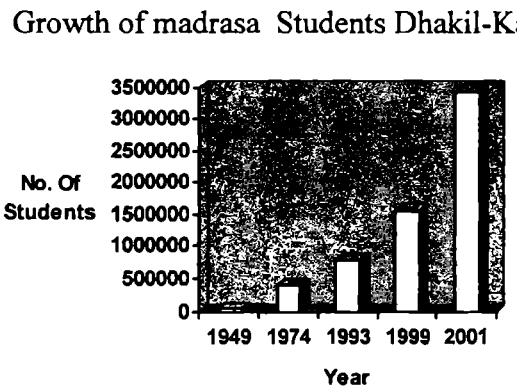

পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চিত্র দেখা যাক। ২০০১ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৬৮,০৫৩টি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, এ সংখ্যা থেকে অবশ্য কিন্ডারগার্টেন, এনজিও চালিত শিক্ষায়তনগুলোকে বাদ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৩৭,৬৩১, এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের সংখ্যা ১৯,৪২৮। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা এই সূত্রানুযায়ী

www.pathagar.com

১৬,৮৪৮,৭৫৭ (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত সাতান্ন)।* এর পাশাপাশি ২০০৩ সালে এবতেদায়ি মাদ্রাসায় পাঠরত ৮৫৬,৩৪০ জন ছাত্রের তুলনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সকল স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শিক্ষকের সংখ্যা ১২৮,৩৮০, এর মধ্যে শিক্ষিকা মাত্র ৭%, আর শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ২৭। একই সূত্র অনুযায়ী মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩২৬,৩৬৯ জন, এর মধ্যে শিক্ষিকা রয়েছেন শতকরা ৩৯ জন (৩৯%)। আর শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৫৪। এদিক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভালো।

আলিয়া মাদ্রাসার ঐতিহ্য অনুযায়ী এই শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কিছু কিছু ইসলাম বহির্ভূত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও গুরুত্ব খুবই কম। যেমন উদাহরণস্বরূপ প্রথম শ্রেণিতে পঠনীয় বিষয় হলো ১. কোরান : কোরান মজিদ ও তাজবীদ, ২. আরবি : আদ-দুরুসুল আরাবিয়্যাহ ১ম, ৩. আকাইদ ও ফিকহ শিক্ষা। আর সাধারণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলা সহজ পাঠ ১ম অথবা 'এসো, ইসলামী কায়দায় বাংলা শিখি', গণিত : এবতেদায়ি গণিত এবং ইংরেজি : ইসলামি কায়দায় মাদ্রাসা A. B. C।

দাখিল পরীক্ষার সাধারণ বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নম্বর বণ্টন থেকে বিষয়টি আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কোরান ও ইসলাম সম্পর্কিত ৫টি বিষয় ইসলামের ইতিহাস নিয়ে নম্বর ৬০০, আর বাংলা গণিত ইংরেজিসহ সাধারণ ৪টি বিষয়ে নম্বর ৪০০।

ঝোঁকটা পরিষ্কার এবং বোধগম্যও বটে। বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বইগুলো লেখা ও ছাপানোর মান অতি নিম্নমানের। ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, নিম্নমানের শিক্ষাদান ও নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তকের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার যে কী বেহাল অবস্থা ও শিক্ষার মান যে কী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আমরা যে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের কথা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি তা আলিয়া মাদ্রাসা ভিত্তিক, যাকে একসময় বলা হতো নিউ স্কিম মাদ্রাসা সিস্টেম (New scheme Madrasa Education)। মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু একদেশদর্শী নয়, এর ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ, আধুনিকতার দৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন এবং শিক্ষার মান যতদূর সম্ভব অধঃপতিত।

কিন্তু আলিয়া মাদ্রাসার বাইরেও বাংলাদেশে সরকারি (এখন পর্যন্ত) অনুমোদন বহির্ভূত নানা ধারার সনাতনী শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এদের সংখ্যা কত, শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি সম্পর্কিত

---

* Primary Education Statistics-2001, DPE, Dhaka, 2002

www.pathagar.com

কোনো বিশদ তথ্য সরকারের বা জনগণের জানা নেই। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা হলো—

১. খারিজি বা কওমি মাদ্রাসা : কলকাতায় ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় এক শত বছর পরে ভারতের দেওবন্দে খারিজি মাদ্রাসার সূচনা হয়। 'দেওবন্দ দর্শন'-এর প্রবক্তা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহেলভির চিন্তাধারা ভিত্তিতে (দারুল উলুম দেওবন্দ)। এই চিন্তাধারার প্রবক্তারা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবি পন্থী, সুন্নাত ও জামাতের অনুসারী।[১০] এই ঐতিহ্য বহন করে এই আদর্শের বেশ কিছু মাদ্রাসা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাদ্রাসায় কোরান, হাদিস ও ইসলামি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কিছু পাঠদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আরবিই হলো শিক্ষাদানের বাহন। অনেকের অনুমান এ ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা কমবেশি ৫ হাজার। এ শ্রেণির মাদ্রাসাগুলোকে জনসাধারণ ওয়াহাবি মাদ্রাসাও বলে থাকে।

২. মক্তব/ফোরকানিয়া মাদ্রাসা : প্রাথমিক পাঠদানের জন্য গ্রামাঞ্চলে মসজিদভিত্তিক বেশ কিছু ইসলামি শিক্ষার শিক্ষায়তন চালু রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় মক্তব। সাধারণত মসজিদের ইমামই এসবে শিক্ষাদান করে থাকেন। এসব মক্তবে আরবি বর্ণমালা, কোরানের শেষ পারা ও কোরান পড়া শেখানো হয়। এছাড়াও রয়েছে হাফেজি মাদ্রাসা।

৩. ইয়োরোপীয় কিন্ডারগার্টেনের অনুকরণে শহরে কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা নামের প্রতিষ্ঠানও গজিয়ে উঠেছে। এছাড়া ক্যাডেট মাদ্রাসা নামেও মাদ্রাসার আবির্ভাব ঘটেছে কিছুদিন যাবৎ। ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসায়ই যে প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামপছন্দ বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরাই হলো এসব ব্যবসায়ীদের শিকার।

৪.১.৫ মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বলেছে, '...এদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষা একটা পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠেছে। ...ইসলামি শিক্ষারই ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদানই মাদ্রাসার লক্ষ্য।[১১]

অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি আরও এককাঠি উপরে উঠেছেন। কমিটি তার প্রতিবেদনে বলেছে,

www.pathagar.com

'বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত।' হক কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আরও বলেছে, '...মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক,... অধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা।

শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ইত্যাদি।'[১২] ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বিএনপি সরকার প্রণীত শিক্ষা কমিশন (২০০৩) আরও এক ধাপ উচ্চে উঠে বলেছে, শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নয় সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গেও (যেমন প্রাথমিক শিক্ষার) শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে 'শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং অধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। (এই বাক্যগুলো প্রায় অবিকল অবস্থায় শামসুল হক কমিটির প্রতিবেদন থেকে তুলে এনে ২০০৩ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।)

এই প্রতিবেদনটিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই ধরনের কথা বলা হয়েছে। '...এই শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে... শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনী জীবনযাপনে অভ্যস্ত রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে-সুরতে মুমিনরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।'[১৩]

৪.১.৬ ক : মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারত্ব

বলা হয়ে থাকে যে, পয়গম্বর নবুয়ত লাভের অনতিকাল পরেই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে খোলা প্রাঙ্গণে 'দারুল আরকাম' নামে যে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটিই ছিল ইসলামি জগতের প্রথম মাদ্রাসা। হজরত আবুবকর, ওমর প্রমুখ প্রথমদিকের সাহাবিরা এই মাদ্রাসায় মুহম্মদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।[১৪] মুহম্মদ মদিনায় চলে এলে 'মসজিদে নববী'র স্থানে একই ধরনের শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা-ই-সোফ্ফা নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে মদিনার প্রধান শিক্ষালয়। এই শিক্ষালয় থেকে বেরিয়ে আসা পণ্ডিতেরা ইসলাম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। হজরত পরবর্তীকালে এই আদর্শের মাদ্রাসা ক্রমেই ইসলামি জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের আলেমরা মনে করেন যে, এই ভূখণ্ডে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা মুহম্মদ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতিরই উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য বহন করছে।[১৫]

৪.১.৬ খ : মাদ্রাসা সম্বন্ধে অভিযোগ

নিম্নমান, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, কূপমণ্ডূকতা, একদেশদর্শিতা এবং সর্বোপরি আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে না-পারা মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সমাজের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে আছে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ জনমনে দানা বেঁধে উঠেছে, তা হলো শিক্ষাদানের চাইতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসার চাইতেও কওমি মাদ্রাসার প্রতিই এই অভিযোগ বেশি করা হয়। অভিযোগ আছে যে, এখানকার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের সৈনিক হিসেবে তৈরির শিক্ষাদান করা হয়, এমনকি সামরিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে। ঠিক যেমন তালিবানরা আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা যেভাবে দখল করেছিল সেই মডেলে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের অধিকাংশ সদস্যই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে রিক্রুট করা হয়ে থাকে বলে অভিযোগ আসে। কয়েক মাস আগে, সারাদেশে আনুক্রমিক বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী যে বিপুল সংখ্যক সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার করেছিল, এদের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণির মাদ্রাসার তালেবে এলেম। পুলিশি কার্যক্রম জনগণের সন্দেহকে দৃঢ়তর করে। নানা সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এসব জঙ্গি সংগঠন একত্রিত হয়ে একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, যার অধিকাংশ কর্মীবাহিনীর উৎস হলো মাদ্রাসা-সমাজ। একদিকে প্রকাশ্য জন-তৎপরতা, অন্যদিকে পাশাপাশি জঙ্গিকর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই এসব জঙ্গি সংগঠনগুলোর মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য ইসলামি দলগুলোর যোগসাজশে প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিয়ে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।[১৬]

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ১৯৭৪ সালে প্রণীত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন থেকে ২০০৩ সালের প্রতিবেদন পর্যন্ত সব প্রতিবেদনই মাদ্রাসা শিক্ষার অসারতা, সীমাবদ্ধতা ও আধুনিকতার সাথে অসঙ্গতিহীন স্বীকার করেও এর অবলুপ্তির কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি— সব প্রতিবেদনই সংস্কার আনার সুপারিশ করেছে।[১৭] পরিশিষ্ট ২-এ দেখুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ—

১. স্বতন্ত্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আর উৎসাহিত না-করা, ক্রমশ ধর্ম ও নীতিশিক্ষার অধীনে এ শিক্ষাকে মূলধারার সাথে একত্রীকরণ করা (integration)। এজন্য আমাদের সুপারিশ হলো উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে 'ধর্ম

www.pathagar.com

ও নীতিশিক্ষা' নামে একটি শাখা খোলা যেতে পারে, যেখানে মূল কোর্সের সাথে ধর্ম ও নীতিবিষয়ক কিছু পত্র সংযোজন করা হবে।

২. রাষ্ট্রের টাকায় বর্তমান ধরনের কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান (আলিয়া বা কওমি যাই হোক না কেন) প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, বা সরকারি অনুদান দেওয়া যাবে না। আমাদের নীতি হলো সরকারি টাকায় কেবল কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং সেই বিশেষ ধর্মের বিষয় নিয়ে শিক্ষাদানের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। ধর্ম-জাতি ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

৩. উচ্চতর পর্যায়ে এই শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে আনা এবং সাধারণ শিক্ষায় অঙ্গীভূত করা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষায় যে ইসলাম ধর্মসম্পর্কিত বিষয়গুলো পড়ানো হয়, তা সাধারণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা এবং একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। এর ফলে যারা এ বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা নিতে চান, তাদের জন্য আমাদের প্রাক-উচ্চশিক্ষা অবকাঠামোতে সে সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা অন্যের ধর্ম বিষয়েও পাঠের অধিকার রাখবে।

৪. দেশে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 'London School of Oriental and African Studies'-এর অনুরূপ একটি ফ্যাকাল্টি বা ইনস্টিটিউট কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল ক্লাসিক্যাল শৃঙ্খলায় জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৫. অন্য দেশের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি কীভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, সে অভিজ্ঞতা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। পরিশিষ্টে ৩-এ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।[১৮]

৪.২ উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর পেশাজীবী শিক্ষা

আমরা সাধারণ ও বিশেষায়িত শৃঙ্খলায় উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করেছি। আমাদের দ্বিতীয় পর্বের অনুশীলনে আরও বিস্তৃত আলোচনা হবে এবং সেখানে আমাদের সুপারিশ থাকবে।

৪.৩ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি দেশের শিক্ষা বিস্তৃতি সহ-সম্পর্কিত? সোজা কথায়, দেশে এসএসসি পাসের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাড়ে? আরও স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করা যাক, সরকার যদি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে, তার অংশ লাভ হয়ে ফিরে আসবে? আমরা এ নিয়ে

www.pathagar.com

এই পর্বের আলোচনায় যাব না, কারণ বিষয়টি বেশ জটিল এবং বিশদ অধ্যয়নের অবকাশ আছে। এ নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করার আশা রাখি। এখানে শুধু দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সত্যিকার শিক্ষার গুণগত মানের সাথে যে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে একথা অনেকেই বলে থাকেন, যেমন কয়েক বছর আগে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, 'Elementary education is a central component of any kind of economic development... Economic powers such as Japan had high levels of education before they advanced towards industrial development.'[১৯]

শিক্ষার সাথে উন্নয়ন বা উন্নয়নের সাথে শিক্ষাসম্পর্কিত বিষয়টিকে অনেকে শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of Education) নামে অভিহিত করতে চান। দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার করা যাক। শিক্ষাকে একদিকে আমরা ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, আবার অন্যদিক থেকে এটিকে একটি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবেও চিহ্নিত করতে পরি। সমাজ যখন তার বর্তমান প্রয়োজন মেটতে শিক্ষাকে ব্যবহার করে, তখন এটি অবশ্যই ভোগ্যপণ্য। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও ব্যক্তি (যেমন মা-বাবা সন্তানের শিক্ষার জন্য) যে পরিমাণ ব্যয় করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে এই ব্যয়ের কিছু অংশ লাভ হিসেবে ফিরে আসতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যয়কে আমরা বিনিয়োগ হিসেবে ভাবতে পারি। শিক্ষাকে যদি মানব মূলধন বিনিয়োগ (investment in human capital) রূপে বিবেচনা করি, তাহলে আর দশটা ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের মতো এক্ষেত্রেও আমাদের লাভ-ক্ষতির (cost benefit) বিশ্লেষণ করতে হবে। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি রিটার্ন দেয়। আবার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিনিয়োগের চাইতে স্নাতক বা মাধ্যমিক স্তরে বিনিয়োগ বেশি লাভজনক। অর্থনীতিবিদরা বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মানব সম্পদের গুণগত উৎকর্ষতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তাৎপর্যময় অবদান রাখে। সুতরাং একটি দক্ষ সুশিক্ষিত জনশক্তির যোগান দেওয়া হলো ওই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় কাজ। অর্থাৎ দেশের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে, শিক্ষাব্যবস্থা যোগান দেবে প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক, মধ্যস্তরের প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান ও মেধাবী প্রকৌশলী, কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুণবান কৃষি বিজ্ঞানী। এককথায়, একটি শিক্ষিত জনশক্তি। শিক্ষাব্যবস্থাটিকে যদি শিল্প-কারখানার সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্য এক্ষেত্রেও উপকরণ-উৎপাদন বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। আমরা অর্থনৈতিক এই বিশ্লেষণসমূহে যাব না, পরবর্তী প্রকল্পের জন্য আপাতত স্থগিত রইল।

www.pathagar.com

একটি বিষয় তো সাদা চোখেই দেখা যায় উন্নত জীবনের সূচকগুলোর ক্ষেত্রে যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্যসীমা সবখানেই বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। উন্নত পশ্চিমি দেশগুলোর কথা বাদ দিলেও, আমাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর ন্যূনতম সাক্ষরতার হার একশত ভাগের কাছাকাছি। অর্থনীতিবিদরা বলে থাকেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবলতম অন্তরায় হচ্ছে এর অসীম দারিদ্র্য। দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও এর ওপর ভিত্তি করে নানা কর্মকাণ্ড চালিত হলেও অগ্রগতি সামান্যই হয়েছে। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর উন্নয়নের যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ও দারিদ্র্যের বিমোচন দ্রুতলয়ে ঘটিয়েছে, এর পশ্চাতে আছে সেই দেশগুলোতে শিক্ষার ক্ষেত্রে আনা ব্যাপক ও তাৎপর্যময় পরিবর্তন ও অগ্রগতি। এর মধ্য দিয়েই তারা দারিদ্র্যকে হটিয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখা যাবে এর পেছনে রয়েছে মধ্যস্তরের শিক্ষায় সুশিক্ষিত, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি জনশক্তি। এই জনশক্তিটিই দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি সমর্থন দিয়েছে একটি সুসংগঠিত দক্ষ শ্রমশক্তি, যার বিকাশ ঘটেছে একটি শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে টার্শিয়ারি লেভেলের মেধাবী ও সৃষ্টিশীল সুশিক্ষিত গোষ্ঠীটি যুগিয়েছে মেধা, মনন, সৃষ্টিশীলতা ও নেতৃত্ব। অথচ আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মধ্য শিক্ষার স্তরটি সবচেয়ে দুর্বল, সংখ্যার দিক থেকে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, কিন্তু গুণগত মানে অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে গলদ।

শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হলে এক্ষেত্রে অবশ্যই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক পড়ে, নিম্নমানের শিক্ষক দিয়ে ও প্রায় শিক্ষা-উপকরণ ব্যতিরেকে শিক্ষা পেয়ে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বেঠিক জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করে, যা থেকে উৎপাদিত হয় মুক্তান্বেষাহীন আবদ্ধ মনের মানুষ, কখনোই কাঙ্ক্ষিত মানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বেরিয়ে আসতে পারে না। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে প্রাথমিক পর্বে ফি বছর জনপ্রতি ৩০০-৪০০ ডলার ব্যয় করা হয়, সেখানে আমাদের দেশে জনপ্রতি প্রতিবছরে ব্যয় হয় ন্যূনাধিক মাত্র ১২ ডলার।

অপেক্ষাকৃত কম সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর যে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন, পণ্ডিতেরা মনে করেন, এর পেছনে রয়েছে সর্বজনীন ও উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চহারের-উচ্চমানের কারিগরিভিত্তিক মধ্যস্তরের শিক্ষা এবং সুনির্বাচিত-মেধাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা। এসব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি, সঠিক গুণগত মানের শিক্ষার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করা সম্ভব গুণগত মানসম্পন্ন দক্ষজন, যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সম্পদ হিসেবে। সর্বজনীন

www.pathagar.com

শিক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি উৎপাদনমুখী সমাজ, সমাজ উন্নয়নে যেটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আমাদের ভাবতে হবে যে, শিক্ষায় বিনিয়োগ বিফলে যায় না এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে শহর, গ্রাম ও গঞ্জের শ্রেণিকক্ষগুলোতে, ঠিক যেমনটি ভারতীয় শিক্ষাবিদ ড. এস. কোঠারী ১৯৬৬ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The destiny of India is now being shaped in her class rooms'।[২০] দেশের উন্নয়নের সৈনিক হিসেবে একটি সৃষ্টিশীল, অনুসন্ধিৎসু, উচ্চশিক্ষিত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হলে আমাদের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এই বলে যে, 'চিন্তা করতে পারি এজন্য জ্ঞানচর্চা করছি, আর চিন্তা করছি জ্ঞানের জন্য'।

আর এর প্রাথমিক ধাপ হলো প্রতিটি জনপদে, যেখানে স্কুল নেই, গ্রামগঞ্জ নির্বিশেষে প্রতি ১৫০০ জনের জন্য বা ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্কুল, মাদ্রাসা নয়, স্থাপন করতে হবে। এজন্য অঙ্ক কষে হিসেব করে, পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। উদ্দেশ্য একটিই— শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি পরিবারের কাছে। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন— সে পথ ধরে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি।

'উন্নয়ন ও শিক্ষা'— এটি একটি দ্বিমুখী রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো। যুৎসই শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান আসবে, আবার এই উন্নয়নের ধারা উন্নত সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শক্তি যোগাবে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নে। একটি চলমান সমাজের জন্য এই চক্রবৎ সীমাহীন পথপরিক্রমা চলতেই থাকবে। আমরা এ প্রসঙ্গে আমাদেরই মতো একটি দেশ ভিয়েতনাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছে সেটি বিচারে আনতে পারি। পরিশিষ্ট-৪ দেখুন।[২১]

৪.৪ আমাদের সুপারিশে যা নেই

১. উচ্চশিক্ষা (বিশেষায়িত পেশাজীবী ও সাধারণ) নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ।
২. মধ্যস্তরের কারিগরি শিক্ষা অর্থাৎ পলিটেকনিক ও ডিপ্লোমা প্রকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নেই।
৩. পরীক্ষণ পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি।
৪. পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনা নীতি।
৫. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব।
৬. শিক্ষা প্রশাসন— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা এবং শিক্ষায়তনের স্বায়ত্তশাসন। প্রশাসন, কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় শিক্ষকদের ভূমিকা। এ বিষয়গুলো নিয়ে ২য় পর্বে

www.pathagar.com

আলোচনার ইচ্ছে রয়েছে, তবে এখানে মোটাদাগে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তক যাই হোক না কেন, বিষয়বস্তুকে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছে মানসম্মতভাবে পৌঁছে দিতে পারছে না, ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বস্তু ও সারাংশ আত্মীকরণ করতে পারছে না। সমস্যাটি এখানেই।

বর্তমান প্রতিবেদনটিতে শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি (methodology of education) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে যা প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে, তা হলো 'শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান ও শিক্ষার্থী কর্তৃক আত্মীকরণ' প্রক্রিয়া, যাকে আমরা এককথায় বলতে পারি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (delivery mechanism) সংশ্লিষ্ট জটিলতা ও সমস্যা আর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশাসন। কী পড়াচ্ছি, তার চাইতেও প্রকট সমস্যা হলো কীভাবে পড়াচ্ছি এবং কোন ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পড়াচ্ছি। আমরা মোটাদাগে আপাতত এই বিষয়গুলোর সাথে জড়িত কয়েকটি সমস্যাকে এখানে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি—

১. শিক্ষক ও শিক্ষাদানের নিম্নমান এবং তার ক্রমাবনতি। শুধু বেসরকারি স্কুলগুলোই নয়, সরকারি স্কুলগুলোও এই ব্যাধিতে কমবেশি আক্রান্ত। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে—
   ক. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী একটি সুষম ও প্রকৃত মেধা যাচাইক্ষম ব্যবস্থার অনুপস্থিতি;
   খ. প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকসহ সকল স্তরে মেধাবী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকের স্বল্পতা, মফস্বলে তা আরও প্রকট;
   গ. শিক্ষাদান ছাড়াও সরকারি/বেসরকারি নানা কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখা;
   ঘ. সমাজের নিস্পৃহতা ও শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থার কারণে শিক্ষকদের, বিশেষ করে, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মানবেতর ও অসম্মানজনক। ফলে শিক্ষকেরা হীনমন্যতা ও আত্মসম্মানের অভাবে ভোগে।
২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ : প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি দুর্বল ও অপ্রতুল, ফলে স্বভাবতই অকার্যকর।
৩. শিক্ষা প্রশাসন : বর্তমানে পিরামিডের আকারে যে মাথাভারী প্রশাসন কাঠামো বিদ্যমান তা সমস্যার গুণগত সমাধান দিতে পারছে না। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নানা স্তরে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।* সুতরাং

* ২০০৫ সালের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর প্রতিবেদনে দুর্নীতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ অবস্থান ছিল।

www.pathagar.com

একটি বিকল্প সরল অথচ কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা অবশ্য উদ্ভাবন করতে হবে।

উল্লিখিত অব্যবস্থাপনার কারণে আমরা শিক্ষার সাথে যে সরবরাহ ব্যবস্থাটির কথা বলেছি তা শিক্ষা ও সমাজের উন্নয়নে কার্যকরভাবে শুভ ফল বয়ে আনতে পারছে না।

সংশ্লিষ্ট এ সব সমস্যার সমাধানগুলো নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের ওপর—

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও বিভাগকে দুর্নীতি মুক্তকরণ।

খ. সরকারি-বেসরকারি সকল স্কুলকে স্থানীয় প্রশাসনের আয়ত্তে আনা ও এতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্কুল পরিচালনা কমিটিগুলোকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

গ. স্কুল পরিচালনা কমিটি স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষার মান রক্ষণ ও বৃদ্ধিকরণে যত্নবান হবে। মেধাবী-নিষ্ঠাবান শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে একটি প্রায় নিখুঁত পদ্ধতি অবশ্যই উদ্ভাবন করতে হবে।

ঙ. বিভাগীয় ও জেলা শহরে শিক্ষকরা যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষক প্রশাসন, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া/প্রণালিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্বে আরও বিশদ আলোচনা করব।

৪. বয়স্ক শিক্ষা।

৫. শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উন্নয়ন-শিক্ষা সম্পর্ক।

৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সব শিক্ষার্থী যেতে পারছে না বা শিক্ষা গ্রহণ কালে 'ঝরে পড়া' শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আলোচনা।

৭. জাতির মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিসত্তার (যাদের আদিবাসী রূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা এবং প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাসম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

কারিগরি-বৃত্তিমূলক উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের একটি সম্ভাব্য তালিকা

ক. কৃষিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. কৃষি উৎপাদন ও সংরক্ষণ
২. একোয়া কালচার (মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ)
৩. খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি
৪. পশুপালন
৫. কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
৬. হাঁস-মুরগি পালন
৭. দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন
৮. হর্টিকালচার
৯. ইত্যাদি

বিষয়গুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিতে কৃষিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

খ. প্রকৌশল ও প্রযুক্তি

১. ছুতোর শিল্প বা কাঠের কাজ (Carpentry)
২. শিল্পসংশ্লিষ্ট ও সাধারণ বিদ্যুতের কাজ এবং ইলেকট্রনিক্স (Industrial and general electric works & electronics)
৩. গ্যাস ও ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং, আর্মেচার ওয়াইনডিং ও ওয়েল্ডিং
৪. নকশাকরণ বিদ্যা (Draftsmanship) : ম্যাপ চিত্রণ, যন্ত্র চিত্রণ ও স্থাপত্য চিত্রণ
৫. পুরবিদ্যা ও রাজমিস্ত্রির কাজ (Civil and Masonry) : (গৃহ ও অট্টালিকা নির্মাণ, খাল ও দিঘি খনন ইত্যাদি)
৬. কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

www.pathagar.com

৭. অটোমোবাইল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও রিফ্রেজারাইজেশন
৮. রাসায়নিক প্রযুক্তি
৯. ফলিত পদার্থবিদ্যা (অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি, মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ, আলোকসম্পাত, আলোকসজ্জা, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ইত্যাদি)

খ. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার
১. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রশিক্ষণ
২. তথ্যপ্রযুক্তি, ডাটা প্রসেসিং ও প্রোগ্রামিং
৩. কম্পিউটার কম্পোজিশন ও গ্রাফিকস

গ. চামড়া শিল্প প্রযুক্তি (Leather technology)
এর মধ্যে বিষয়বস্তু থাকতে পারে : চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (tanning), জুতাসহ চামড়াজাত বিভিন্ন শৌখিন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

ঘ. টেক্সটাইল প্রযুক্তি (Textile technology)
১. টেক্সটাইল পদার্থবিদ্যা (Textile Physics)
২. টেক্সটাইল রসায়নবিদ্যা (Textile Chemistry)
৩. রঞ্জন দ্রব্য ও রঞ্জন শিল্প
৪. পোশাক তৈরি শিল্প (Design and Manufacture Design and Manufacture)
৫. যন্ত্রায়ণ ও সংরক্ষণ
৬. বুনন, ঘূর্ণন ও বয়ন (Kniting, Spining and Weaving)

ঙ. চিকিৎসাসংক্রান্ত প্রযুক্তি
১. প্রসূতিসেবা ও ধাত্রীবিদ্যা (Mother care. maternity and Nursing)
২. প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যা
৩. চিকিৎসা যন্ত্রায়ণ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি (Medical Instrumentation and Appliances Medical)

চ. ললিতকলা
১. চিত্রাঙ্কণ
২. কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত
৩. নৃত্যকলা
৪. আবৃত্তি ও অভিনয় শিল্প

www.pathagar.com

ছ. ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়াদি

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অফিস ও শিল্প ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও লেনদেন, বাণিজ্যিক গণিত ও ভূগোল, ব্যবসায়িক পরিচিতি : নীতি, সংগঠন ও পদ্ধতি

জ. হিসাবরক্ষণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা

১. হিসাবরক্ষণ নীতি, বিধি ও পদ্ধতি
২. উৎপাদন আয়-ব্যয় হিসাব
৩. ব্যাংক পরিচালনা নীতি ও ব্যাংকের কার্যাবলি
৪. ব্যাংকের হিসাবরক্ষণ

ঝ. দাপ্তরিক কার্যাবলিসংক্রান্ত বিষয় (Secretariat & office maintenance)

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি হতে পারে : অফিস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ফাইলিং সিস্টেম, স্টেনোগ্রাফি ইত্যাদি।

ঞ. বিবিধ

১. সেরিকালচার
২. হর্টিকালচার
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ
৪. প্রাথমিক গ্রন্থাগার সংরক্ষণ
৫. সিরামিকস ও প্লাস্টিক শিল্প
৬. বাঁশ ও বেতের কাজ
৭. মৃৎশিল্প ও খেলনা তৈরি শিল্প
৮. ইলেকট্রোপ্লেটিং ও ধাতুর কাজ

www.pathagar.com

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

১. ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট

তৎকালে চালু মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনেকটা একদেশদর্শী উল্লেখ করে এই কমিশন সুপারিশ করেছিল :

"১১.৩ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

১১.৪ ...আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাসার ছাত্ররা. তিনবছরব্যাপী বৃত্তিমূলক ধর্মশিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে..."[২২]

মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন স্পষ্ট কোনো বক্তব্য রাখেনি, শুধু বলেছে যে এসব শিক্ষার মেয়াদ মোট পাঁচ বছর (ডিগ্রি ৩ + পোস্ট গ্রাজুয়েট ২ বছর), কোর্সগুলোর নাম, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি, একটি কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির হাতে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে। খুদা কমিশন সে সময় গঠিত বাংলাদেশ ইসলামি শিক্ষা সংস্কার সংস্থার স্মারকলিপির ভিত্তিতে এসব সুপারিশ গ্রহণ করেছিল।* এই সুপারিশে বেশ পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন সুপারিশে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, মাদ্রাসায় প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের সাথে একীভূত করা।

২. জাতীয় শিক্ষা কমিটি, ১৯৯৭

এই কমিটির রিপোর্ট মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মন্তব্য করে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নত ও আধুনিকীকরণের নামে ১০ দফা সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে কয়েকটি হলো :

'১. বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী

---

* এই স্মারকলিপির সারকথাগুলো ছিল : '...জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একীভূত করা এবং পরবর্তী স্তরগুলোকেও সমপরিসর ও যথাসম্ভব সমন্বিত করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা।'

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

১০. মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষার সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথক পরিচালক (মাদ্রাসা)-এর পদ থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চপর্যায় তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চপর্যায়ের মধ্যে মানের সমতা নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।'[২৩]

৩. জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ২০০৩

এই কমিশনের প্রতিবেদনেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার একটি শক্তিশালী অঙ্গে পরিণত করার সবচেয়ে বেশি জোরালো প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যদিও ১৯৯৭-এর প্রতিবেদনের সাথে নীতিগত ও মৌলিক পার্থক্য নেই। কমিশনের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন স্তরে নানা ধরনের শিক্ষা প্রণালি, বিশেষ করে, মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকায় শিক্ষার জগতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে কমিশন মনে করে যে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা দেশের জন্য অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না।' পঞ্চদশ অধ্যায়ে, প্রাথমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালুকরণ শিরোনামের আওতায় কমিশন এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছে নিম্নোক্তভাবে :

"অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ায় যে সব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রতীয়মান সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিশুরা চিন্তাচেতনায় ভিন্নতর হচ্ছে।
- কিছু শিশুর মনে হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে।
- কোনো কোনো শিশুর মনে দাম্ভিকতা ও অহংবোধ সৃষ্টি হতে পারে।
- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের ফলে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব সৃষ্টি হতে পারে।
- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের অন্তরায়।

এত সুন্দরভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পরও কিন্তু কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষার, এমনকি প্রাথমিক স্তরেও, অবলুপ্তির সুপারিশ করেননি, যদিও কমিশন তার সুপারিশে স্পষ্ট ভাষায় বলছে :

- প্রাথমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে আবশ্যিক কারিককুলাম বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে।

www.pathagar.com

(কমিশনের সুপারিশ মতে আবশ্যিক কারিকুলাম তৈরি হবে— 'বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি' বিষয়াদি নিয়ে)

একদিকে কমিশন সুপারিশ করছে অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যকতা নিয়ে, অন্যদিকে বলছে বেশ অসুবিধা আছে এটি প্রবর্তন করতে। কারণ—

- দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের বিষয়ে অত্যধিক স্পর্শকাতর।
- রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিধায় ইসলাম ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
- মাদ্রাসায় পঠিত কতিপয় বিষয় যেমন বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি এগুলো সাধারণ শিক্ষা বা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতেও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।
- একালের অভিভাবক ও পড়ুয়ারা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠায় ইংরেজি বিদ্যালয়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

কমিশন কী ধরনের স্ববিরোধিতায় ভুগছে— এই উক্তিগুলোই তার প্রমাণ। কমিশন তাই কোনো ভিন্নধারার শিক্ষাপদ্ধতি চালুর সুপারিশ না-করে কতিপয় জগাখিচুড়ি 'সুপারিশ' করেছে, যার সারকথা হলো যেমনটি আছে তাই থাক, শুধু একটি কোর কারিক্যুলাম বাধ্যতামূলক করে শিশুর ওপর আরও কিছু বোঝা বাড়িয়ে দাও।

মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম শিক্ষাক্রমেও একই আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশনের সুপারিশ অতি ভয়াবহ। কমিশন ২০০২ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে বলেছে। এই সুপারিশগুলোর কতিপয় হচ্ছে :

১. 'ফাযিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান।'
২. 'এ সুপারিশ ব্যস্তবায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।'

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিশনের মত হলো : 'শিক্ষার্থীদেরকে ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনী জীবনযাপনে অভ্যস্ত রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে-সুরতে প্রকৃত মুমিনরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।'

মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন, জনবল কাঠামো, প্রশাসন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েও এই কমিশন অনেক সুপারিশ করেছে। মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আধুনিক রাষ্ট্র প্রশাসনে যুক্ত করার দুশ্চিন্তায় কমিশন মারাত্মক দুটি সুপারিশ করে যা প্রণিধানযোগ্য :

'১৪. বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার, বি.সি.এস (টেকনিক্যাল শিক্ষা) ক্যাডারের অনুরূপ বি.সি.এস (মাদ্রাসা শিক্ষা) ক্যাডার সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

১৫. ...দেশের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি জেলায় একটি সরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।'

এই শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা যে কীভাবে মৌলবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছেন এসব সুপারিশই তার সাক্ষ্য। তাদের এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে, যার কিছু কিছু ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের পথে, লোকায়ত বাংলাদেশের সামান্য রেশ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে তা তিরোহিত হবে এবং রাষ্ট্রটি ক্রমেই পরিণত হবে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে।

৪. মৌলানা আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট, ১৯৪৯

১৯৪৯ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সৃষ্টির আদর্শকে সামনে রেখে সমগ্র পাকিস্তানে যেন মোটামুটি একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ববাংলা সরকার একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে যার নেতৃত্বে ছিলেন মৌলানা আকরাম খাঁ। এই কমিটির সরকারি নাম ছিল— 'East Bengal Educational System Reconstruction Committee.'। এই কমিটি গঠনের লক্ষ্য ছিল, '...to advise Government on the reconstruction of the present illbalanced system of educaton of the province, so as to make it more fitted to meet the new demands of this new state.'[২৪]

ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম যে আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে অক্ষম এই অবস্থান থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার সুপারিশ করা হয়েছিল। এজন্য ব্রিটিশ যুগেই ১৯৪৬-'৪৭ সালে 'সংস্কারিত মাদ্রাসা' প্রবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ করে মাধ্যমিকের সমতুল্য শ্রেণিগুলোতে, যা উদার মুসলিম সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেছিল। 'সংস্কারিত মাদ্রাসা'গুলোর চরিত্র বোঝার জন্য আমরা একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি আকরাম খাঁ কমিটির প্রতিবেদন থেকে : 'From every class or stage of High Madrasa a student may pass on to the corresponding class or stage of the general line, but not vice versa. A boy who joins a Reformed Madrassa can at any subsequent stage, if he desires to transfer himself to the institutions of the general type, will not find himself handicapped for his lack of knowledge of the general (secular) subjects. But this is not possible in the case of boys reading in old-typed Madrasahs.'

প্রসঙ্গত ১৯৪৬-'৪৭ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

ক. বাধতামূলক :

১. ভার্নাকুলার (বাংলা বা উর্দু)	: ১০০
২. ইংরেজি	: ২০০
৩. অংক	: ১০০
৪. ইতিহাস ও ভূগোল	: ১০০
৫. আরবি (২য় পত্র)	: ২০০
৬. ফিকহ, ফারাইয ও আকাইদ	: ১০০
খ. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোনো একটি (যেমন : অতিরিক্ত ইংরেজি, অতিরিক্ত অংক, ইসলামের ইতিহাস, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন...)	: ১০০
সর্বমোট	: ৯০০

এই বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে ইসলামি বিষয় ও সেক্যুলার বিষয়ের মধ্যে আনুপাতিক গুরুত্ব হলো ৩০০ : ৫০০ (৩:৫) (বর্তমানে সাধারণ দাখিলে এই গুরুত্ব-অনুপাত দাঁড়িয়েছে ঠিক উলটো, অর্থাৎ ৫:৩)। আমরা যে কালের উলটো দিকে হাঁটছি এটি তারই প্রমাণ।

'সংস্কারিত মাদ্রাসা' ও সাধারণ বা সেক্যুলার মধ্যমিক শিক্ষার একত্রীকরণের (integration) প্রশ্নে আকরাম খা কমিটি অনেক দূরদর্শিতা ও আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিয়েছে, যা আমাদের বর্তমানকালের, বিশেষত শেষ দুটি শিক্ষা কমিশন দেখাতে ব্যর্থ। এ প্রসঙ্গে কমিটির বক্তব্যের খানিকটা উদ্ধৃতি দিলে পরিষ্কার হবে. '...now the main question is wether the Reformed Madrasah system should retain its seperate existence when the general education so long vitiated by being `godless' in its nature, will lose its `godless' character under the new scheme of reorganisation of the general education recommended by us. Public opinion also has it that it should merge into the general system, or conversely, the general system should merge into it. ...The High Madrasahs are modified form of secondary schools along which they are under the same board and the university and its students take the same examinations and are entitled to the same degrees and previleges. The term 'Madrasah' used for these institutions was obviously with the object of attracting the orthodox section of Muslims who disliked the exclusively secular type of education imparted in the school. It is therefore, only a question of recognising formally what actually exists in fact.'।

প্রচলিত জুনিয়র দাখিল (৪ বছরের) শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সে সময় চালু জুনিয়র স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের সাথে এক করে দিয়ে মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র দাখিল

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রমের অবলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছিল এবং এর শিক্ষা বছরকে নামিয়ে ৩ বছর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কমিটির মত ছিল : 'In our opinion, primary education in this province should be universal, free and compulsory, and should have the highest priority in the province's national-building programme.'।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন হবে— একই শিক্ষাক্রম সকল বিদ্যালয়ে অনুসৃত হবে, তাই পূর্বেকার মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা মাদ্রাসাগুলোতে রাখার আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এবং যেহেতু পূর্বেকার জুনিয়র (৪ বছরব্যাপী) বা দাখিল পাঠক্রম, বিষয়বস্তু হবে সাধারণ জুনিয়র স্কুল স্তরের অবিকল, তাই হাই-মাদ্রাসা শিক্ষায় দাখিলেরও ঘটবে অবলুপ্তি। সুতরাং আকরাম খাঁ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী হাই-মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম শুরু হবে সাধারণ জুনিয়র স্কুল স্তর অতিক্রম করে আসার পর। সে সময় জুনিয়র স্কুল কারিকুলাম ছিল ৩ বছরব্যাপী (পঞ্চম-সপ্তম শ্রেণি) আর প্রাথমিক স্তর ছিল ৪ বছর মেয়াদি (প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি)।

পুরাতন মাদ্রাসা স্কিমের সাথে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ একত্রীকরণ সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির সাথে অসম্ভব বলে মনে করেছেন এই কমিটি। কারণ পুরাতন মাদ্রাসা স্কিমের শিক্ষার লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে কমিটির সুপারিশ হলো প্রাথমিক ও জুনিয়র স্কুল স্তর পর্যন্ত (প্রথম-সপ্তম শ্রেণি) মাদ্রাসাসহ সকল স্কুলে একই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হবে। এই শিক্ষা স্তর অতিক্রম করে কেউ যদি পুরাতন স্কিমের মাদ্রাসায় যেতে চায় সে পথ উন্মুক্ত থাকবে। সে সাধারণ শিক্ষার স্কুল এবং হাই-মাদ্রাসাতেও শিক্ষাক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

আকরাম খাঁ কমিটি প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষাকে সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করলেও মাধ্যমিক স্তরে কেবল মুসলিম ছাত্রদের জন্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কমিটির পর্যবেক্ষণ ছিল নিম্নরূপ :

'Religion has been made a compulsory subject for Muslim pupils. Though there are difficulties in the way of it, we have got to face them for there is unanimous demand for it from the Muslim community. There will be provision for the teaching of other religions also. But if a non-Muslim guardian wishes that his ward should not be taught his religion at school, he will have an alternative paper in Ethics and Morals.'।

এই কমিটির সুপারিশের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল :

১. তখন প্রচলিত ৪ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে ৫ বছর (পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) বৃদ্ধি, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা;

www.pathagar.com

২. মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে দ্বাদশ শ্রেণি করা; এবং
৩. উচ্চ-মাধ্যমিক (Intermediate) স্তরের বিলুপ্তি সাধন। এই অতিরিক্ত বছরটিকে সাধারণ ডিগ্রি স্তরের সাথে জুড়ে দেওয়া; ফলে
৪. সাধারণ ডিগ্রি হবে ৩ বছর মেয়াদি।

ইসলাম বিষয়ে সত্যিকার অর্থে উচ্চতর স্তরে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই কমিটি একটি 'University of Islamic Learning' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এর অতিরিক্ত দায়িত্ব হবে পুরাতন স্কিমের মাদ্রাসাগুলোর গুণগত মান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা

যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতনী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে জাতীয় মূল শিক্ষাস্রোতের সাথে মেলানো যায়, এ নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতে নানা চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানে সমস্যাটি যেরকম, ভারতে ও বাংলাদেশে সেরকম নয়। পাকিস্তান একটি ঘোষিত ইসলামি রাষ্ট্র, যার অনুশাসনের ভিত্তি হলো কোরান ও সুন্নাহ। সেখানকার শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলাম ধর্ম একটি প্রবল ও প্রধান ভূমিকা রাখে। একই সাথে পাকিস্তান হতে চায় একটি আধুনিক রাষ্ট্র, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। এতদসত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংযুক্ত করা যাচ্ছে না, তার কারণ, ১. কট্টর ইসলামপন্থীরা তা চায় না, চায় না মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনো ধরনের বড় পরিবর্তন। তারা চায় সাবেকি ঢঙেই এই শিক্ষা চলতে থাকুক মাদ্রাসা মক্তবে, আর ২. মাদ্রাসার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের দাবি মেটাতে পারার মতো যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সার্বিকভাবে মূলধারার সাথে অঙ্গীভূত করা যাচ্ছে না।

আর ভারতের সমস্যা অন্য ধরনের। এটি একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে অন্তত সাংবিধানিকভাবে, সকল মানুষের অধিকার সমান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতকে অবশ্যই বলা যেতে পারে ২য় অথবা ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। অন্য যেকোনো দেশের মুসলমানদের মতো এখানকার মুসলমানরাও পালন করতে চায় ইসলাম অনুসৃত জীবনাচার। আর সাধারণ মুসলমানরা মনে করে, মাদ্রাসা-মক্তবভিত্তিক শিক্ষা তাদের এই জীবনাচারেরই অঙ্গ। এই শিক্ষাকে মনে করা হয় ইসলামি বা মুসলিম শিক্ষা। ভারতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কতিপয় মূলনীতিকে ঠিক রেখে অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনপদ্ধতি, ধর্ম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারে। ভারতে তাই একটি এককেন্দ্রিক সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যাকেও তাই একেকটি রাজ্য একেকভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে। এখানে আবার মুসলিম শিক্ষার জন্য নিবেদিত কিছু ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানও আছে, যার প্রভাব সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় এখনো প্রবল। কলকাতায় রয়েছে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাদর্শন ও ঐতিহ্যের ধারক 'কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা', আর রক্ষণশীল মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান দিল্লিস্থ 'দেওবন্দ মাদ্রাসা'।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষার মূলস্রোতের সাথে অঙ্গীভূত করার সাফল্যের মাপকাঠিতে ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সকলের অগ্রভাগে, এমনকি কেরালাকেও এ রাজ্যটি পেছনে ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে

www.pathagar.com

রয়েছে ৫০৮টি মাদ্রাসা— প্রাথমিক থেকে আলিম পর্যন্ত এগুলোর শিক্ষা, প্রসাশন, পরীক্ষাবিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'-এর (West Bengal Board of Madrasa Education) সার্বিক তত্ত্বাবধানে। পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সামগ্রিক কারিকুলাম ত্রি-ধাপ বিশিষ্ট (three tiered)

সারণি ৬.১ : *ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান*

নাম ও ধাপ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়	সমতুল্যতা
১ম ধাপ : জুনিয়র হাই-মাদ্রাসা	১৬৭	৫ম-৮ম শ্রেণি	সাধারণ শিক্ষার সমতুল্য
২য় ধাপ : হাই-মাদ্রাসা	২৩৯*	৫ম-১০ম শ্রেণি	"
৩য় ধাপ : সিনিয়র মাদ্রাসা#	১০২	১ম - ১০ম শ্রেণি	এই পরীক্ষাকে বলা হয় আলিম এবং এটি মাধ্যমিকের সমতুল্য
* এই ২৩৯টির মধ্যে ৫০টিতে দ্বাদশ শ্রেণি (উচ্চ-মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়ানো হয়, তবে এর পাঠ্যসূচি সাধারণ উচ্চ-মাধ্যমিকের অনুরূপ এবং এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।			
# এই সিনিয়র মাদ্রাসাগুলোতেই আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অধিক গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এখানে পড়েই শিক্ষার্থীরা আলিম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে।			

মাদ্রাসা বোর্ড আরবি ও ইসলামি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ১০ম শ্রেণির আলিম পরীক্ষা ও সাধারণ হাই-মাদ্রাসার ১ম শ্রেণির হাই-মাদ্রাসা পরীক্ষা দুটিই পরিচালনা করে মাদ্রাসা বোর্ড। দুটি পরীক্ষাই পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই সাধারণ শিক্ষার স্রোতে চলে যায়, আর এতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না, এভাবেই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়ে থাকে। বাকি মাত্র শতকরা ১৫ অংশ শিক্ষার্থী উচ্চতর ইসলামি ধর্মীয় বিষয়ে পড়তে যায়, এজন্য তাদেরকে নিম্নলিখিত কারিকুলামের মধ্য দিয়ে যেতে হয় :

- ফাজিল : ২ বছর
- কামিল : ২ বছর (গ্রাজুয়েশন)
- মুমতাজুল মুহাদ্দাসিন (মাস্টার্স ডিগ্রি) : ২ বছর

এসব সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি বিশুদ্ধ ইসলামি ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়সূচির (theological courses) ভিত্তিতেই দেওয়া হয়, এসব ডিগ্রির সাথে সাধারণ শিক্ষার ডিগ্রির কোনো সমতুল্যতা টানা হয় না এসব পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদান করে থাকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার দশম শ্রেণির মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষার সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মাধ্যমিক পরীক্ষার সফলতার সাথে তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ, গত ২০০৫ সালের পরীক্ষায় ১৯,৩১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৫ শতাংশ পাস করেছিল, আর এর মধ্যে ১৫ শতাংশ পেয়েছিল প্রথম শ্রেণি। শুধু পরীক্ষার সাফল্য নয়, এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনেও সফল হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি ড. আবদুস সাত্তারের উক্তি :

'Many of our students gain prominence in life. There are many high court judges, IAS and IPS officers and countless doctors, engineers, who were schooled in our madrassas.'[২৫]

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষায় এ ধরনের নতুন মাত্রা যোগ করায় ভারতে এবং ভারতের বাইরেও এই শিক্ষা প্রণালিতে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত একজন মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতিকে চিঠি লিখে এ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ড. সাত্তার এই ইচ্ছেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও সেক্যুলারাইজ করা ও মূল শিক্ষাব্যবস্থার সথে অঙ্গীভূত করার সফলতায় পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা বোর্ডকেই ভারতের 'ব্যুরো অব স্কুল এডুকেশন'-এর একমাত্র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এনসিআরটির স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষায় এই পরিবর্তনের ফলে হাই-মাদ্রাসাগুলোর সাথে সাধারণ স্কুলের কোনো তফাত দৃশ্যত থাকেনি, যদিও ইতিহাস ও ঐতিহ্যিক কারণে মাদ্রাসা নামটি বহাল রয়েছে। একমাত্র আরবি বা ইসলামি বিষয়সম্পর্কিত একটি পত্র বাধ্যতামূলক ব্যতিরেকে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির সাথে সাধারণ স্কুলের পাঠ্যসূচির কোনো পার্থক্য নেই। পশ্চিমবঙ্গের এই সংস্কারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষার নিঃশব্দ বৈপ্লবিক বিবর্তনের ফলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে :

- প্রতিষ্ঠানগুলোর সেক্যুলার চরিত্রের জন্য এগুলো জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এর ফলে ৫০৮টি মাদ্রাসায় বর্তমানে (২০০৬) ৪০,০০০ হাজারেরও বেশি হিন্দু শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষালয়গুলোতে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা একই ক্লাসে পড়াশোনা করছে একসাথে, যা আগে কল্পনাও করা যেত না।
- এখানকার মাদ্রাসাগুলোতে কোনো মোল্লা-মৌলবি দিয়ে পড়ানো হয় না, এমনকি আরবি ও ইসলামি বিষয়গুলোও। প্রতিটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের

www.pathagar.com

স্কুল সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষককে দিয়ে পাঠদান করা হয়। ফলে সাধারণ শিক্ষালয়গুলোতে যেমন মুসলিম শিক্ষক রয়েছে, এই তথাকথিত মাদ্রাসাগুলোতেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু শিক্ষক। হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থীর পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকের অবস্থানের ফলে মাদ্রাসাগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে একটি চমৎকার উদার, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির পরিবেশ, যা সেক্যুলার ভারতবর্ষের জন্য অবশ্যম্ভাবী।

এ ধরনের চমৎকার উদ্যোগের ফলে অর্জিত হয়েছে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ বোঝাবুঝি, যা এতদিনকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে দেবে অচিরেই। আরবি ও ইসলামি বিষয়গুলো বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হিন্দু শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, শিক্ষাদানের চমৎকার কৌশলের কারণে। প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী এসব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে, এর মধ্যে গড়ে ১২ শতাংশ শিক্ষার্থী হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কোনো অঞ্চলের মাদ্রাসায় হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি। এই শিক্ষালয়গুলোতে মাইনে তুলনামূলকভাবে কম এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৪২:১, যা মোটামুটি সন্তোষজনক।

মাদ্রাসা বোর্ড প্রেসিডেন্টের মতে, 'The presence of non-Muslim teachers, Students and non teaching staff enriches our institutions'। একটি মাদ্রাসার জনৈক মুসলিম শিক্ষক তার হিন্দু সহকর্মীদের প্রসঙ্গে একটি প্রত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'We are proud to have 5 Hindu teachers among the 15 teachers.'। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলো কত আধুনিক ও অদ্বৈত, একথা জানাতে এর কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা সদা উৎসুক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাকে এর কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠানটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হয়েছে। তবে শর্ত এই যে, প্রতিষ্ঠানটির দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, শিক্ষার্থীর এবং শিক্ষক নিয়োগ উভয় ক্ষেত্রে। আর প্রতিষ্ঠানটির আদি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, অর্থাৎ আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইসলামি বিষয়াদির অধ্যয়ন অনুশীলনের পাশাপাশি নানা শৃঙ্খলার সেক্যুলার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে শিক্ষা কারিকুলামে, গাবেষণায় ও জ্ঞানচর্চায়। আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আনন্দের সাথে এসব শর্তাবলি মেনে নিয়েছেন।

আমাদের সুপারিশ হলো পশ্চিমবঙ্গের এই অভিজ্ঞতা আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার সেক্যুলারাইজেশন ও আধুনিকায়নের কাজে লাগানো উচিত হবে।

www.pathagar.com

ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা

দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে কমিউনিস্ট শাসিত এই দেশটি আমাদের কাছাকাছি। আমাদের মতোই, এমনকি আমাদের চাইতেও অনেক বেশি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রটিতে গুরুত্বের সাথে নজর দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব পড়বে। বিপ্লবের পর থেকেই যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছে, যার ফল এখন ফলতে শুরু করেছে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করে আসছে।

১৯৯৭ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মোট ২২ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়ছে ১৩.২ মিলিয়ন (৫৮%), ৪.৩ মিলিয়ন মাধ্যমিক স্কুলে, আর ২৬,০০ জন পড়ছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। উচ্চমান সম্পন্ন সাক্ষরতার হার অনেক, ৯২%। ১৯৯৭ সালে তারা বাজেটের ১০% খরচ করত শিক্ষাখাতে, এই অংক ২০০০ সালের মধ্যেই তারা ১৫%-এ উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে ৫০%-এরও বেশি ব্যয় করা হয় প্রাথমিক খাতে, বিশেষায়িত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ১৯%, আর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ১২%। এই শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম দিয়েছেন নগ্যুয়েন ভন হেই, ত্রান দাই নঘিহ, টন দ্যাটতুং-এর মতো নামকরা বিজ্ঞানীরা। প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যলয় পর্যন্ত একটি সার্বিক চমৎকার শিক্ষাব্যবস্থা ভিয়েতনামিরা গড়ে তুলেছে, আর গুরুত্ব দিয়েছে কারিগরি, বৃত্তিমূলক, পেশাজীবী ও উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর। দেশটির শিক্ষা অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তর হচ্ছে :

১. কিন্ডারগার্টেন (কিন্ডারগার্টেন ও সিনিয়র কিন্ডারগার্টেন)
   ৬ বছর
২. সাধারণ
   প্রাথমিক : ৫ বছর
   মাধ্যমিক : ৪ বছর
   বিশেষায়িত মাধ্যমিক : ৩ বছর
৩. বৃত্তিমূলক
   প্রাথমিক শিক্ষার পর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ
   মাধ্যমিক শিক্ষার পর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ
   পেশাজীবী প্রশিক্ষণ
   বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

৪. গ্রাজুয়েট বা স্নাতক
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়
৫. পোস্ট-গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর
৬. ডক্টরেট

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২০০৩ সালে প্রণীত একটি রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে ভিয়েতনামের অগ্রগতির বিপুল প্রশংসা করে আশা প্রকাশ করে যে, ২০১০ সালের মধ্যে এমডিজির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তা অর্জনে ভিয়েতনাম সক্ষম হবে।[২৬]

www.pathagar.com

জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশমালা

আন্তর্জাতিকভাবে এটা আজ স্বীকৃত সত্য যে প্রাথমিক শিক্ষাই হলো জীবনব্যাপী শিক্ষার বুনিয়াদি স্তর। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং সমান দক্ষতা নিয়ে বেড়ে ওঠার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। পরবর্তী জীবনের ভিত্তি এ পর্যায়েই রচিত হয়। তাই জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু, গোত্র-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দেশের সকল শিশুর মধ্যে যেন দেশ ও সমাজ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সেজন্য একই ধারার প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হবার পর থেকে সেই বিশ্বসভা এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহ এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে উপস্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি, সেটা আজ থেকে ৫৭ বছরের আগে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত মানবাধিকার সনদের ২৬ নম্বর ধারায় ঘোষিত হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে, 'everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory and unitary.'। বাংলাদেশ এই বিশ্বসংস্থার অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। সুতরাং জাতিসংঘের ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। আবার ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শিশু অধিকার সনদের ৭ নম্বর ধারায় উক্ত দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়, 'The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He (or she) shall be given an education which will promote his (or her) general culture and enable him, on the basis of equal opportunity, to develop his (or her) abilities, his (or her) individual judgment and his (or her) sense of moral and social responsibility and to become a useful member of society.'

জাতিসংঘ সেই 'elemental and fundamental stage' কোন শ্রেণি পর্যন্ত হবে তা না বললেও, শিশু অধিকারের ৭ নম্বর ধারায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে বুনিয়াদি ও মৌলিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষায় 'সুযোগের সমতা' বিধান করতে হবে। কাজেই মৌলিক ও বুনিয়াদি স্তরে শিশুদের যদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে শ্রেণি বিভাজন আরও প্রকট ও সুদৃঢ় হবে এবং বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টভঙ্গির অধিকারী হবে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই শ্রেণি বিভাজিত জগাখিচুড়ি শিক্ষাই চালু আছে। এদেশে প্রায় ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শনাক্ত করা যায়। যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়। আবার মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৪টি প্রধান ধারা বিদ্যমান— সুন্নী মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, এবতেদায়ি মাদ্রাসা ও সাধারণ দাখিল-আলিম-ফাজিল-কামিল মাদ্রাসা। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ইংরেজি মাধ্যম, ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা। এছাড়া আছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন 'এ লেভেল ও লেভেল' স্কুলের নামে 'কোচিং সেন্টার', যেগুলো লিমিটেড কোম্পানি নামে রেজিস্ট্রিকৃত। এর ফল যে জাতির ওপর শুভ হতে পারে না, অধিকাংশ শিক্ষা কমিশন বা কমিটিই তা স্বীকার করলেও কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করেনি, বরং আপোষকামী কিছু সুপারিশ করেছে। যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭'র প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে যে, 'প্রাথমিক শিক্ষার এসব ধারা শিক্ষামান ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে ভিন্ন। ফলে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শিশুদের যোগ্যতার মধ্যে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়। তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে সমমানের সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অন্তত প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।' ওই পর্যন্তই, কোনো কমিশনই বলছে না যে ভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। এমনকি কোনো সরকার থেকেও কোনো ঘোষণা আসেনি যে তারা একটি সর্বজনীন একই পদ্ধতির গণমুখী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে 'এত বছরের মধ্যে সংবিধানের যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়ন করবে'।

অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, শ্রেণিগত বৈষম্য এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, দেশ আজ ঐক্যবদ্ধ হবার পরিবর্তে, এক সাংঘাতিক হানাহানির পর্যায়ে উপনীত। এ থেকে উত্তরণ না-ঘটলে দেশের সামনে যে আরও কত বিপদ অপেক্ষা করে আছে তা কে বলবে? এ থেকে উত্তরণের পথ আজ থেকে ৫৭ বছর আগে জাতিসংঘের সেই প্রস্তাবনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তথা 'বুনিয়াদি ও মৌলিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা হতে হবে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, সর্বজনীন, বৈষম্যহীন এবং সে শিক্ষা হবে মাতৃভাষায়।' বিগত ৫৭ বছরের মধ্যে

www.pathagar.com

জাতিসংঘের ওই সর্বজনসমর্থিত সিদ্ধান্তটি এদেশে আজো কার্যকর করা যায়নি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে?

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে ওই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে চুপ করে বসে থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষাসংক্রান্ত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ করে তুলেছে। যেমন ১৯৬০ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural organization) "Convention against Discrimination in Education" শীর্ষক এক দীর্ঘ আলোচনা সভায় মিলিত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে সর্বসম্মতভাবে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওইসব বৈষম্যের ধরন এবং তা দূর করার জন্য কিছু সুদূরপ্রসারী সুপারিশও করে। UNESCO'র ওই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য পালনীয়। শিক্ষায় 'বৈষম্য' বলতে কী বোঝায় কিংবা কীভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে Article-১-এ বলা হয়, 'the term discrimination includes any distinction, exclusion, limitation or preference which being based on race, colour, sex, language, religious, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the purpose of effect or nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular.

a. Of depriving any person or group of persons of access to education of any type or any level,
b. Of limiting any person or group of persons to education of an inferior standard' (৪ : ১৯৬০ সালের ইউনেস্কো ঘোষণা)

একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রতি কতভাবে বৈষম্য প্রদর্শন করা যায়, উক্ত ঘোষণায় তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে পারে রাষ্ট্রে বসবাসকারী যেকোনো জনগোষ্ঠী। রাষ্ট্র যদি কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষভাবে সদয় হয়, তাহলে তা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাধারণত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ কর্তৃক ৮ম সংশোধনী একটি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন। ওই সংশোধনীতে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি বৈষম্য ও অবমাননা প্রদর্শন করা হয়েছে।

Article-৪ এ বলা হয়, 'The State Parties to the Convention undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy, which by methods appropiate to the circumstances and to

www.pathagar.com

national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education and particular: (a) To make primary education free and compulsory; make secondary education in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law; (b) To ensure that the standards of education are equivalant in all public institutions of the same level and that the conditions relating to the quality of education provided are also equivalent.'

১৯৫২ সালে ইউনেস্কো ভারতের মুম্বাইয়ে 'Regional Conference on Free and Compulsory Primary Education in South Asia and the Pacific' নামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার পর একটি বিশ্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে। UNESCO একই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে করাচিতে ১৯৫৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৬০ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত, যা করাচি পরিকল্পনা নামে খ্যাত। 'Regional Meeting of Representative of Asia Member State on Primary and Compulsory and Free Primary Education of seven years or more within a period of not more than twenty years (1960-1980).'। ১৯৬২ সালে ২-১০ এপ্রিল টোকিওতে এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষামন্ত্রীগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে করাচি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং বাধ্যতামূলক-অবৈতনিক-সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সামগ্রিক শিক্ষা কাঠামো এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা দেন। বলা হয়, 'প্রাথমিক শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই : এটিকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদি স্তর হিসেবে দেখতে হবে।' 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ'-এর ওপর শিক্ষামন্ত্রীদের এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তেহরানে ১৯৬৫ সালের ৪-১৬ সেপ্টেম্বরে। সে সম্মেলনের প্রধান বক্তব্য ছিল 'সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা অর্জন অতি জরুরি।' শিক্ষামন্ত্রীদের পঞ্চম সম্মেলনে MINEDAP-V: Those Responsible for Economic Planning in Asia and the Pacific.' এই স্লোগান উত্থাপন করে যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' এবং সিদ্ধান্ত নেয়—

১. কেবল দেশে নয়, প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান শিক্ষাবৈষম্য দূর করতে হবে।

www.pathagar.com

২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নের জন্য সম্মেলনে নিচের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয় :
ক. 'সকলের জন্য বিজ্ঞান' প্রোগ্রাম চালু করতে হবে;
খ. শিক্ষা ও কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে;
গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নতি সাধন করতে হবে;
ঘ. একইসঙ্গে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারা চালু রাখতে হবে;
ঙ. আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে হবে ইত্যাদি।

ইউনেস্কোর ২০তম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে সোফিয়ায়। সেখানে MINEDAP-V-এর নিরক্ষতা দূরীকরণ এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। এ ব্যাপারে কার্যকর কর্মপন্থা নিরূপণের জন্য ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। সেখানে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) নামে একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে APPEAL আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৬ সাল সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বছর হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদযাপিত হয়। 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বছর'-এর মূল স্লোগান ছিল :

১. নিরক্ষরতা বর্তমানে প্রধান ভূমণ্ডলীয় সমস্যা;
২. নিরক্ষরতা প্রধানত অনুন্নয়ন ও দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণের প্রধান শর্ত ছিল নিরক্ষরতা দূর করা; এবং
৩. নিরক্ষরতা কোনো রাষ্ট্রের ভাগ্য বা পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় নয়, যা দূর করা যায় না। সমাজ বিবর্তনের মহাসড়কে এক একটা সামাজিক অবস্থা, আন্তরিকতা ও দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রত্যয় (Commitment) নিয়ে লেগে থাকলে তা দূর করা সম্ভব ও দূর করা হচ্ছেও।

APPEAL-এর সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে 'সবার জন্য শিক্ষা'র ওপর ওই বিশ্ব সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষায় সবার অভিগম্যতা এবং সবার প্রতি সমান মনোযোগের আহ্বান জানানো হয় এবং নব্বই দশকের জন্য সকল বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর জন্য উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'Primary Schooling can take the form of different modes of delivery (formal schools, traditional centres of learning, community centres etc.) but should be unitary in its outcome of standards and potentials for further education.' অর্থাৎ যেভাবেই দেওয়া হোক, প্রাথমিক শিক্ষা হবে unitary অর্থাৎ

www.pathagar.com

সবার জন্য সমান এবং একমুখী। ২০০০ সালের মধ্যে যে টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলো, তা হলো 'each country will strive to ensure that at least 80 percent of all 14 years old boys and girls attain a common level of learning achievement of primary education set by the respective national authorities.'।

'শিক্ষা পাওয়ার অধিকার সকলের আছে'— জাতিসংঘের এই ঘোষণাকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ৫-৯ মার্চ থাইল্যান্ডে UNESCO'র তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় 'World Declaration on Education for All' সম্মেলন। 'সারা বিশ্বে সকল বয়সের নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা হলো মৌলিক অধিকার' এই আদর্শে বলীয়ান হয়ে সম্মেলনে Article-৩ এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে সকল শিশু, যুবক এবং বয়স্ক মানুষের বুনিয়াদি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা উচিত। 'An active commitment must be made to removing educational disparity, udeserved groups: the poor, street and working children, rural and remote populations, nomads and migrant workers, indenigious people, ehnic, racial and linguistic minority, religious, those displaced by war; and people under occupation, should not suffer any discrimination in access to learning opportuinity'। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে।[২৭]

www.pathagar.com

সিডও এবং এমডিজি সনদ

সিডও : (CEDAW: Conference for Elimination of all forms of Discrimination Against Women). আমরা সিডও'র নারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যমান বৈষম্য নিয়ে আলোচনায় না-গিয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে সিডও'র প্রস্তাবগুলো দেখতে পারি। সনদের ১০ নম্বর আর্টিকেল 'Equal rights in Education'-এ বলা হয়েছে— 'Governments will act to eliminate discrimination against women in education. This includes giving women equal access to education and vocational guidance; the same curriculum, examinations, standards for teaching and equipment; and equal access to scholarships and grants.'

সিডও'র এই অঙ্গীকার শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের বৈষম্যহীন সমান অধিকারসম্পর্কিত আমাদের সংবিধানের আর্টিকেলসমূহ (১৭.ক,খ,গ) এবং মানবাধিকার রক্ষাবিষয়ক আর্টিকেলগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যে, কেবল মাত্র ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ও শ্রেণির ভিত্তিতে কারো প্রতি কোনোরকম বৈষম্য করা চলবে না। বাংলাদেশ সিডও'র ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক স্তরে এবং নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৫০%-এ উন্নীত হলেও মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। মধ্যপথে পড়া ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা (drop outs) ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক বেশি, উচ্চস্তরে এই ব্যবধান ক্রমশ বর্ধমান। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা তাৎপর্যময়ভাবে অনেক কম। কারিগরি, কৃষি ও প্রকৌশল বিদ্যায় মেয়েশিক্ষার্থী ভর্তি হার বেশ কম, মোটামুটি ৯-১০%। উচ্চস্তরে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৪%। এই চ্যালেঞ্জগুলো সাফল্যের সাথে মোকাবেলা না-করতে পারলে এই শতাব্দীতে বাংলাদেশের নারীরা আন্তর্জাতিক স্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় অনেক পিছিয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান জ্ঞানের ফারাক উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। আমরা তাই মনে করি, শিক্ষা কার্যক্রমে এই বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে একদিকে যেমন প্রতিবছরে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করতে হবে, অন্যদিকে এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে।

হাজার বছরের অভিলক্ষ্য ও বাংলাদেশ : (MDG: Millenium Development Goal)

www.pathagar.com

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় 'হাজার-বছরের উন্নয়ন অভিলক্ষ্য' বা এমডিজি। নিম্নলিখিত ৮টি অভিলক্ষ্য দফায় দফায় বাস্তবায়নের জন্যে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়। বিশ্ব থেকে যতদূর সম্ভব দ্রুত দারিদ্র্য-ক্ষুধা, লিঙ্গ-বৈষম্য নির্মূল করে সকল বিশ্ববাসীকে শিক্ষিত করে তুলে বিশ্বকে নির্মল রোগমুক্ত পরিবেশ উপহার দেওয়া যাতে অচিরেই সম্ভব হয়। সংক্ষেপে অভিলক্ষ্যগুলো হচ্ছে :

1. Eradicate extreme povery and hunger
2. Achieve universal primary educarion
3. Promote gender equality and empowerment
4. Reduce child mortality
5. Improve maternal health
6. Comat HIV/AIDS, malaria and other diseases
7. Ensure environmental suatainability
8. Make global partnership for development

বাংলাদেশের জন্য আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে হবে, তা হলো : দৈনিক ১ ডলারের কম আয়কারী জনগণের সংখ্যা ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাকে অন্তত ৫০% এ নামিয়ে আনতে হবে (অভিলক্ষ্য ১); সকল ছেলেমেয়েকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে (অভিলক্ষ্য ১); প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য অপনোদন করতে হবে; শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান; শিশু অপুষ্টির লিঙ্গ-বৈষম্যের নির্মূলীকরণ; মাতৃমৃত্যুর হার শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়ে আনা; সকলের জন্য প্রসবকালীন-স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া নিশ্চিতকরণ এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে চালিত দাঙ্গা-সংঘর্ষ-সহিংসতা পুরোপুরিভাবে নির্মূল করতে না-পারলেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহতকরণ। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য এমডিজি কিছু নির্দেশক সূচকও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

তৃতীয় অভিলক্ষ্যটি (নারী-পুরুষ সমতা ত্বরান্বিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন) বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি, প্রত্যাশিত লক্ষমাত্রা অর্জনের প্রাথমিক ধাপ হলো— '২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে উচ্চতর স্তরে লিঙ্গ-বৈষম্য অপনোদন।' বাংলাদেশ অবশ্য ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এই বৈষম্য অপনোদনে স্বস্তিকর সাফল্য অর্জন করলেও শিক্ষায়তন থেকে 'ঝরে পড়ার হার'-এ মেয়েশিক্ষার্থীরা এখনো এগিয়ে। এখানে আমরা কেবল এমডিজির শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপরই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখলাম।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৭

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত

আমরা এতক্ষণ দেখলাম একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-লিঙ্গ-জন্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সামনে শিক্ষার সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বসংস্থাসমূহ ১৯৪৮ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়াম করে আসছে। উন্নত দেশসমূহে এর সিংহভাগ বাস্তবায়িত হলেও আমাদের দেশের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশে তা আজ কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কোনো কোনো দেশ আন্তরিক রাজনৈতিক প্রত্যয় ও সদিচ্ছার সঙ্গে তার বাস্তবায়নে সযত্ন হলেও সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশ তার বাইরে নয়। বরং সাংবিধানিকভাবে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, সর্বজনীন শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও তা অনেকখানি অপূর্ণ রয়েছে, যদিও কিছু সাফল্য যেমন মেয়েদের নীট ভর্তির হার ছেলেদেরকে অতিক্রম করে গেছে। কেন? বিশ্বসংস্থাসহ দেশের বেশ কিছু গবেষক তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হওয়া অনেক দেশই জাতিসংঘ ও UNESCO'র সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়ে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেণি ভিত্তিক ও বিভিন্ন ধারার বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে।

যেহেতু ধর্ম মানুষের জীবনের একটা বড় অংশ দখল করে আছে, সেহেতু শিক্ষায় ধর্মের স্থান কী হবে, এ নিয়ে অনেক দেশেই দীর্ঘদিন ধরে তর্কবিতর্ক অব্যাহত আছে। তাই একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান কী হবে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি।

আমরা এতক্ষণ একমুখী সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তা কার্যকর করার বিভিন্ন কর্মতৎপরতার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরলাম। একথা আজ সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গঠনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়, জাত-পাত, ধনী-নির্ধন-লিঙ্গ নির্বিশেষে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত একমুখী, সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। এর অন্যথা হলে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন বৈষম্যমূলক স্রোতে পরিচালিত হলে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাবমানস, জাতিসত্তার সম্পূর্ণতা বোধকেই কেবল খণ্ডিত করা হয় না, জনগণের

www.pathagar.com

বিভিন্ন অংশকে উদ্দেশ্যহীন সংঘাতময় বৈপরীত্যের মধ্যেও ঠেলে দেওয়া হয়। বর্তমান বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এবং দেশব্যাপী আত্মঘাতী সন্ত্রাস ও বোমা হামলার মতো ভয়াবহ ঘটনা এই নির্মম সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

www.pathagar.com

কর্মশালা, মতবিনিময় ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ, উন্নয়নকর্মী ও নেতা, মানবাধিকার-সক্রিয় মানুষ, শিক্ষানুরাগী সমাজ সচেতন নাগরিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতামত বিনিময় ও আলোচনা সভায় মিলিত হই। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজ পরিদর্শনকালে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণীজনের সাথে মতবিনিময় করি। এসব মতবিনিময় থেকে উঠে আসা মতামতের একটি সারাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আলোচনা সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

প্রাক-প্রাথমিক

১. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ৪ বছর থেকে শুরু হতে পারে। এক্ষেত্রে ১-৩ বছর পর্যন্ত শিশু মাতৃকোলেই থাকবে। এসময় শিশুদের শিক্ষার সাথে যুক্ত করা ঠিক নয়।

প্রাথমিক

১. কেউ কেউ বলেন, প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি থাকা উচিত, কেউ বলেন দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে, আবার কেউবা ইংরেজি থাকাই উচিত নয় বলেন।
২. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।
৩. নীতিশিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই থাকা দরকার, কেউ কেউ বলেন ৪র্থ শ্রেণি থেকে।
৪. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আটবছর মেয়াদি হওয়া উচিত।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা ১ম-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়া উচিত।
৬. ৫ম শ্রেণি থেকে তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের) আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

মাধ্যমিক

১. মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবণ্টন হতে পারে এরকম— বাংলা-২০০, ইংরেজি-১০০, গণিত-১০০, বিজ্ঞান-২০০ (যার মধ্যে ফিজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে), সামাজিক বিজ্ঞান-২০০ (এর মধ্যে ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান থাকবে), মানবিকতা-১০০ (এর মধ্যে ইতিহাস ও দর্শন থাকবে), ফাইন আর্টস-১০০ অর্থাৎ সর্বমোট নম্বর = ১০০০।

www.pathagar.com

২. মাধ্যমিক স্তরে নৈর্ব্যক্তিক প্রথাকে পরিবর্তন করে এর স্থলে শূন্যস্থান পূরণ, বিপরীত শব্দ, হ্যাঁ/না ইত্যাদি থাকতে পারে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত হতে পারে, এরপর থাকবে উচ্চশিক্ষা স্তর।

৪. মাধ্যমিকে ইংরেজি ২০০ নম্বরের না হয়ে ১০০ নম্বরের হতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগবিষয়ক

১. শিক্ষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে, সেখানে অনেক অসঙ্গতি এবং অব্যবস্থাপনা দেখা যায়। যার ফলে প্রশিক্ষণ নিয়েও শিক্ষকরা ভালো শিক্ষাদান করতে পারেন না। এসব অসঙ্গতি দূর করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের মন্তব্য : শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বেশ অসংগতি ও অব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এর ফলে প্রশিক্ষণ নিয়েও শিক্ষাদানের মান বাড়ছে না— এমন অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবশ্য প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে যারা শিক্ষাদানে ব্যাপৃত। আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো— শিক্ষকদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ক্লাসরুমে স্থানান্তরিত হচ্ছে না। ফলে কোটি কোটি টাকার অপচয় হচ্ছে। এটি কেবল প্রমোশনের উপায় বা চাকুরি স্থায়ীকরণের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা আশা রাখছি, আমাদের ২য় পর্বের প্রস্তাবনায় এ নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকবে।

মাদ্রাসা/ধর্মশিক্ষা

১. ধর্মশিক্ষাকে স্কুলপাঠ্য না করাই উচিত। এটি আধ্যাত্মিক বিষয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়েদের সাথে বিভাজন তৈরি করে।

২. সকল ধর্মের মূলনীতি নিয়ে সর্বজনীন একটা ধর্মীয় শিক্ষা থাকতে পারে।

৩. স্কুলে যে সিলেবাস আছে মাদ্রাসাগুলোতে সেই সিলেবাস চালু করলে শিক্ষার ব্যবধান অনেক কমে যাবে।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

৫. আমাদের মন্তব্য : আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপারিশ করেছি, যার সাথে উপরের মন্তব্যগুলোর সাথে খুব একটা মতানৈক্য নেই।

www.pathagar.com

অন্যান্য

১. আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ।
২. দেশে যে ১১ রকমের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে।
৩. শিক্ষা-সংস্কার করতে হলে শিক্ষাবিদ ছাড়াও অন্যান্য পেশার ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে কাজটা করা উচিত।
৪. এদেশের উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো কৃষি। এজন্য কৃষিভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৫. পাঠ্যপুস্তকে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলো বিশদভাবে আনতে হবে এবং এসব তথ্যের স্বচ্ছতা থাকতে হবে।
৬. শিষ্টাচারের জন্য ৫০-১০০ নম্বর থাকা উচিত।
৭. লিঙ্গ শিক্ষা, নাগরিক অধিকার এই বিষয়গুলো পাঠক্রমে থাকা দরকার।
৮. জেলখানায় যেসব নারী কয়েদি রয়েছে তাদের সন্তানদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. সুশীল সমাজের সমন্বয়ে একটা শিক্ষা-কমিশন গঠন করতে হবে।
১০. বর্তমানে যে গ্রেডিং সিস্টেম চালু হয়েছে তা সংস্কার করতে হবে।
১১. কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার পাশাপাশি লোকায়ত শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
১২. লিঙ্গসমতা আনতে কিছু শব্দ যেমন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা— এগুলো ব্যবহার না করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এই টার্মগুলো ব্যবহার করতে হবে।
১৩. শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট আরও বাড়াতে হবে এবং শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৈষম্যহীনভাবে বাড়াতে হবে।
১৪. যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না তা যাচাই করে দেখা দরকার।
১৫. শিক্ষার্থীকে শিক্ষানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের, বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।
১৬. সংবিধানকে সহজভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে মানবাধিকার ও আইন বিষয় সম্পৃক্ত করা উচিত।
১৭. পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের কথা থাকবে, নদী-গাছ-পাখি-পাহাড় ইত্যাদির কথা থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা এগুলোর সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারে।
১৮. শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১৯. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
২০. স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডিতে সুশিক্ষিত লোককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে প্রশাসনের ক্ষমতা কমিয়ে কমিটিকে ক্ষমতা দিতে হবে।

www.pathagar.com

২১. কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
২২. প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন ও বর্তমানধারায় পাবলিক পরীক্ষা রাখা ঠিক কি না তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
২৩. শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রতিটি থানায় অন্তত ১টি ভালো স্কুলে টেলিস্কোপ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
২৪. ভালো শিক্ষক গ্রামে থাকার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদেরও গ্রামে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।
২৫. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত থাকা উচিত কি না তা বিবেচনা করতে হবে।
২৬. সহ-বিষয়সমূহ শিক্ষার মূলস্রোতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
২৭. শিক্ষকদের সময়োপযোগী বেতন প্রদান করতে হবে।
২৮. মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমই থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা বাংলা ভাষায় দেওয়া হবে কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।
২৯. আদিবাসী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং পথশিশুদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা দরকার।
৩০. পাঠ্যসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বিষয় রাখা উচিত।
৩১. আদিবাসীরা যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত।
৩২. শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার।
৩৩. শিক্ষাব্যবস্থা হবে প্রাতিষ্ঠানিক, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।
৩৪. শিক্ষকদের ভালো শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
৩৫. প্রধান শিক্ষকদের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা দরকার।

সবমিলিয়ে আমরা প্রায় দেড় শতাধিক মতামত ও সুপারিশ পেয়েছি সারা দেশ থেকে মতামত বিনিময়ের ভিত্তিতে। এখানে কেবল এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সারাংশ উত্থাপন করা হলো। অনেক বক্তব্য ছিল অভিন্ন ও পুনরাবৃত্তিমূলক, যেমন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক বেতন ও অনান্য সুবিধাদি, শিক্ষার মান নিয়ে উৎকণ্ঠা, মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে উৎকণ্ঠা, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য, ধর্মশিক্ষা, শিষ্টাচার ও নীতি শিক্ষা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার স্থান ও শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

আমাদের বক্তব্য : আমরা উত্থাপিত বিষয়ের অনেকগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদনের যথাযথ স্থানে আলোচনা করেছি এবং মতামত ব্যক্ত করেছি। যেসব বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়নি, যেমন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা,

www.pathagar.com

প্রশাসনিক ও পরিচালনা বিষয়াদি, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি, সেসব সমস্যা নিয়ে আমরা আমাদের ২য় পর্বে বিশদ আলোচনা করব। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আমাদের বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট। নীতি হিসেবে শিক্ষাদানের সর্বক্ষেত্রে এমনকি উচ্চতর গবেষণাতেও মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে বাংলা। তবে জ্ঞানের কোনো কোনো শাখা, যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান বা আইন শাস্ত্রে নানাবিধ কারণে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিলে যদি মনে হয় শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে বা যথোপযুক্তভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারছেন না, সে ক্ষেত্রেই কেবল ইংরেজিতে শিক্ষাদান করা যেতে পারে। সেই সাথে শিক্ষকের ওপর এবং ওই শাস্ত্রসমূহ শিক্ষার সাথে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যেমন সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার ওপর দায়িত্ব বর্তায় অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সেসব দূর করা এবং দ্রুত বাংলাতে এই বিষয়গুলো পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে 'শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার'— এই নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। বয়সের যেকোনো সময়ে বা অবস্থান থেকে, তা সে পথশিশুই হোক কী বয়স্ক মানুষই হোক, সকলেরই শিক্ষা গ্রহণের অবশ্যই সুযোগ করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

বিশিষ্টজনদের মতামত

সাধারণ শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষদের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা করে বা আলোচনা সভার বাইরে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বেশকিছু বিশিষ্টজনের কাছ থেকে আমরা প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও অভিমত সংগ্রহ করি। আমরা সেসব গুণীজনের একটি তালিকা তুলে ধরছি এবং তাদের মতামতের সংক্ষিপ্তসার (বিনা মন্তব্যে) উদ্ধৃত করছি।

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

১৭ এপ্রিল ২০০৬, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ মিলনায়তন
সভাপ্রধান : অধ্যক্ষ এ.কে.এম. শামসুল আলম

ড. অজয় রায়, মুখ্য গবেষক
আলোচনার প্রারম্ভে তিনি বিভিন্ন মনীষীদের শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষানীতি তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, আইনস্টাইন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অভিভাবক বা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে একেক ধরনের ধ্যান-ধারণা দেখা যায়। একজন ছাত্রের ধ্যান-ধারণাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা দরকার। ধারণাপত্রের মধ্যে যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, একজন মানুষ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, রসায়নবিদ যা-ই হোন না কেন, সর্বোপরি তিনি একজন মানুষ হোন। এই মানুষ হবে, সৃষ্টিশীল, সংস্কৃতমনা, উৎপাদনশীল, প্রকৃতিমনা, বিজ্ঞানী, প্রতিভাবান ও কর্মক্ষম। তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কেবল ভদ্রলোক সৃষ্টি করতে চাই না, বরং এমন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই যারা বিশ্ব মানবতার জন্য কাজ করবে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে। বিশ্বমানবতা ছাড়া ব্যক্তি মানুষ কখনোই ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর এমন শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত।

ড. শেখ জিনাত আলী, অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেন এটি গুরুত্ব পায়। শিক্ষকদের আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সাব্বির আজাদ, অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, ময়মনসিংহ
আমরা অবশ্যই সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার শিক্ষা চাই। বাস্তবায়নের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে এর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করতে হবে।

ফেরদৌস আরা মাহমুদা, শিক্ষক ও সাধারণ সম্পাদক, মহিলা পরিষদ, ময়মনসিংহ
এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিবিদদের নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। 'শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার'— এই প্রত্যয় বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আমার মনে হয়, সুশীল সমাজ সংসদে না-গেলে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

নজরুল ইসলাম চুন্নু, অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, ময়মনসিংহ
শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও এর স্পিরিটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ছোট বয়স থেকেই। কিন্ডারগার্টেন জাতীয় স্কুলগুলোতে আমাদের দেশের কথা, সংস্কৃতির কথা শেখাতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকা দরকার।

জনাব আবুল কাসেম, জেলা শিক্ষা অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত)
গবেষকদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তবে একমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের পথে অনেক বাধা, যা অতিক্রম করতে সকলের সমবেত চেষ্টা দরকার।

গোলাম মোস্তফা, সমন্বয়কারী, আরডিএস
মানুষ হওয়ার জন্য যেসব বিষয় দরকার, তা এ প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে দেখা যায় বর্তমানে শিশুদের খেলাধুলার সামগ্রীতেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে দেশজ সংস্কৃতির সাথে সমন্বয়হীন খেলনা শিশুদের দেওয়া হচ্ছে। ফলে শৈশবে তারা দেশজ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে পারছে না এবং দেশের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হচ্ছে না। দেশের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কহীন একটি কিন্ডারগার্টেন সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মা-বাবারা সন্তানদের কিন্ডারগার্টেনে দিচ্ছেন। এটি রোধ করা প্রয়োজন।

ড. অজয় রায়, মুখ্য গবেষক
আলোচনা গুটিয়ে এনে তিনি গবেষকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়া ও অভিমতগুলো নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ

www.pathagar.com

জানিয়ে তিনি আশ্বাস দেন যে এসব মন্তব্য চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এ.কে.এম. শামসুল আলম, সাবেক অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ

সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, এরকম একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আইইডি ও গবেষকদের ধন্যবাদ। শিক্ষার সবদিক স্পর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরা একটি প্রশংসনীয় কাজ। তবে বাস্তবায়নের সমস্যা আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হলে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দরকার রয়েছে। আমরা চাই বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারহীন, ইতিহাস সচেতন, বৈষম্যহীন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে সকলের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। সকলের জন্য সরকারকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রস্তাবিত রূপরেখাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পুস্তিকাকারে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া, একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। অনুকূল সময় এলে হয়ত বাস্তবায়নের সুযোগ আসবে। এই আশাতেই কাজ করা।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

২৯ এপ্রিল ২০০৬, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, চট্টগ্রাম

সভাপ্রধান : অধ্যাপক অনুপম সেন

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক অনুপম সেনের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার চরম দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষার গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। যদিও সরকার বলছে দেশে শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং সে কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ আজ পর্যন্ত বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা মানের দিক থেকে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নলক্ষ্যী নয় বরং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই গবেষণায় মানবাধিকার ও মানবতার কথার উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু এই স্তরে যে পাঠক্রম চালু রয়েছে তাতে শিক্ষার্থীরা ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। আগে মাধ্যমিক শিক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল এগুলো পৃথকভাবে থাকত। তাতে শিক্ষার্থীরা এসব বিষয় ভালোভাবে জানতে পারত কিন্তু বর্তমানে এগুলো একত্রিত থাকায় শিক্ষার্থীরা কোনোটাই ভালোভাবে জানতে পারছে না। ব্রিটিশরা যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করে গিয়েছে এই গবেষণাপত্র তারই আধুনিক সংস্করণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

আমির আহম্মেদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মুকুল নিকেতন

গবেষণাপত্রটিতে যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করতে হবে। তার মতে, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে। এটি দেশ ও মানুষের জন্য কল্যাণমুখী নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করার জন্য শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও মূল্যায়ন, শিক্ষকদের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও মেধাবীদের নিযুক্তি, নারীশিক্ষা ও নারী শিক্ষকদের সমস্যা, অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক সংখ্যা বাড়িয়ে একজন শিক্ষককে যেন যতদূর সম্ভব একাধিক বিষয়ে পড়াতে না-হয় সে সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

প্রফেসর মোকাররম হোসেন, প্রশিক্ষণবিদ, অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত), টিটি কলেজ

শিক্ষা দর্শন প্রসঙ্গে শিশু শিক্ষণ বিষয়ে মন্তেসরি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা দর্শন নিয়ে আলোচনা থাকলে ভালো হতো। শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে, কিন্তু ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়নি, কারণ শিক্ষাদানের মানে দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যে ১ লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণদান সার্থক হয়নি। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে তার ফলাফল শূন্য। সুতরাং কেবল তাত্ত্বিকভাবে প্রশিক্ষণ দিলেই হবে না বরং এর বাস্তব দিকও থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়টি তাই প্রতিবেদনে আনতে হবে গুরুত্বের সাথে।

যে স্তর থেকেই ইংরেজি পড়ানো শুরু হোক না কেন, মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতির কারণে ইংরেজি শিক্ষা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে আসতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মুখ্য কারণ ইংরেজিতে ফেল করা। প্রাথমিক স্তরে যেখানে ৯০% শিশু ভর্তি হয়, সেখানে মাত্র ২০% এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং এইচএসসি এবং উচ্চতর শিক্ষার স্তরে এ সংখ্যা আরও কমে যায়। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে শিশুরা ইংরেজিভীতির কারণে ক্লাসে যেতে চায় না। কিশোর কিশোরীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী করার লক্ষ্যে স্কুলগুলোতে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধাদি থাকা প্রয়োজন।

ড. মারুফী খান, অধ্যক্ষ, কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ

গ্রাম ও শহরের স্কুল ও কলেজের মধ্যে বৈষম্য ঘুচবে না, যদি না গ্রামগঞ্জে ভালো ভালো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। আমাদের শিক্ষা ও পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবোধ অবশ্যই জাগিয়ে তুলতে হবে, আর এজন্য চাই একটি সেক্যুলার ও একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা।

মাধ্যমিক স্তরে ৫০ নম্বরের জন্য বহুবিধ পছন্দ করার সুযোগ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। মাল্টিপল চয়েস পরীক্ষাপদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী সবকটি প্রশ্নের উত্তর 'ক' অথবা 'খ' দিলেও অন্তত ১৭-১৮টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়। এতে বিশ্লেষণী দক্ষতা তৈরি হয় না। ফলে এইচএসসিতে এসে একটা বিরাট গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়। পরীক্ষাব্যবস্থায় যদি আবার আগের মতো ১০০ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক, কিংবা বহুবিধ পছন্দভিত্তিক পরীক্ষণের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে তাহলে ভালো হয়। প্রশ্নপত্রে শূন্যস্থান পূরণ, হ্যাঁ/না, বিপরীত শব্দ— এরকম বিষয় আনা যেতে পারে।

১ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত শিশুর মায়ের কোলে থাকাই যথার্থ। শিশুর ৩-৫ বছর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করা যেতে পারে। স্কুলের প্রতি অনাগ্রহই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের আচরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রবন্ধে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখায় ভূগোল বিষয়টি নেই কিন্তু ইতিহাস এবং বিজ্ঞান রয়েছে। দেশকে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাশাপাশি ভূগোলকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য যদি ৫০ নাম্বার থাকে, সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের জন্য ৩০ নম্বর এবং ২০ নম্বর অন্তত ভূগোলের জন্য রাখা উচিত।

অধ্যক্ষ শাহাব উদ্দীন, মুসলিম বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয় ও কলেজ

আপনারা প্রশ্ন রেখেছেন যথার্থই, প্রস্তাবগুলো সুন্দর এবং এতে আমাদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে? সংখ্যার দিক দিয়ে না-হলেও মানের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ থাকলে ভালো হতো, আশা করি ভবিষ্যতে থাকবে। বিভিন্ন বিষয়ে মানবন্টন নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক এবং কিন্ডারগার্টেন সিস্টেম থাকা উচিত নয়। শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রবণতা কেমন হওয়া উচিত— এ সম্পর্কে গবেষণায় বিস্তারিত থাকা প্রয়োজন। স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকদের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা দরকার।

শাহাদাৎ হোসেন খান হিলু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সচিব, বহুরূপী নাট্য গোষ্ঠী

এই প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, যদি-না রাজনৈতিক দলগুলোর সেক্যুলার সর্বজনীন একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের রাজনৈতিক প্রত্যয় থাকে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

নুমান আহম্মদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি

তিনি উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতা আমাদের দেশের মানুষের গৌরবজনক অর্জন। কিন্তু আমরা সেই অর্জনকে ধরে রাখতে পারিনি। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী এবং বৈষম্যহীন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার অভাব। বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার অবস্থা মোটেও ভালো নয়। আমরা যাতে আগামী দিনগুলোতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারি— এরকম একটি মানসিকতা নিয়ে প্রাথমিক সূচনা হিসেবে শিক্ষা বিষয়ে সমীক্ষার কাজটি হাতে নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আইইডি পরিবেশ নিয়ে কাজ করে। এই পরিবেশ কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশ নয় সামাজিক পরিবেশও বটে। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যেও আইইডি কাজ করছে। সেজন্য আইইডি মনে করে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই কাজটি হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা শিক্ষা সংস্কারের জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, যেখানে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়।

এরপর আইইডির সমন্বয়কারী শাহনাজ সুমী প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটির রূপরেখার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন।

জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মানবাধিকার নেতা

শ্রেণিকক্ষে কীভাবে শিক্ষকরা পাঠ্য বিষয়গুলোকে কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরতে পারে, যাতে শিশুদের মনে দাগ কাটে তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আবুল মোমেন, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

প্রস্তাবানুযায়ী যথার্থই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, আর সে কথা মনে রেখেই শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যেখানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় সেখানে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি হয়। এটি একদিনে হবে না, তবে শুরু তো এক জায়গা থেকে করতে হবে। এককালে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি ছিল, এখন এটি নেই বলে প্রাথমিক-মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ভালো শিক্ষক হ্রাস পাচ্ছে, শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। সে জায়গাটিতে ফিরে আসতে হবে। যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। প্রস্তাবনায় এই সাংস্কৃতিক বাতাবরণের দিকটি আনতে হবে। শিক্ষকদের সমস্যা অনেক, সুযোগসুবিধার অভাবে এরা প্রান্তিকজনে পরিণত হয়েছেন, সমাজে মর্যাদা হারিয়েছেন। ফলে সমাজে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ভূমিকা, যা এক সময় আমাদের সমাজেই ছিল, কমে গেছে। এতে ক্লাসরুমে শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে, অভিভাবকেরা কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকছেন। আমাদের

www.pathagar.com

সর্বাত্মক চেষ্টা হওয়া উচিত শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনার। এক্ষেত্রে শিক্ষকরাই কিন্তু বড় বাধা।

স্কুলে যেসব জিনিস থাকা দরকার তা হলো— হলরুম, খেলার মাঠ, পাঠাগার, লাইব্রেরি, গবেষণাগার। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত কী হবে তার একটা দিক নির্দেশনা থাকা দরকার। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে আরও সৃষ্টিশীল করে তুলতে হবে।

বর্তমানে উচ্চবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তরাও বাংলা মাধ্যমে শিক্ষায় অনীহা প্রকাশ করেন। এতে করে আজকের প্রজন্মের শিশুরা নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানতে পারছে না। যেখানে রবীন্দ্র, নজরুল, জয়নুল আবেদীন নেই, সেখানে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি হতে পারে না। বরং সেখানে তৈরি হতে পারে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ব্যবস্থাপক। আমরা বাংলা বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক উদাসীন। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে।

শীলা মোমেন, সংস্কৃতি কর্মী ও শিক্ষক, ফুলকি, চট্টগ্রাম

বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও, আমাদের আদর্শের সাথে সাযুজ্য রেখে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপর তিনি জোর দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ফুলকি আন্দোলনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অভিভাবক-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ২ বছর করলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে ১-৩ বছর পর্যন্ত শিশু মাতৃকোলেই থাকবে। এ সময় শিশুদের শিক্ষার সাথে যুক্ত করা ঠিক নয়।

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবিত শিক্ষার রূপরেখায় শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন পর্বে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি একটি প্রশসংনীয় কাজ। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি মূল্যবান সংযোজন এই গবেষণাপত্র। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা যেমন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম... এগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। গবেষকরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবগত আছেন। কিন্তু বড় প্রশ্ন হলো এই উদ্যোগের পরিণতি কী, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া কী করে অগ্রসর হওয়া যাবে? এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমর্থন।

ড. এস. এ. সামাদ, অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন মুখ্য সচিব

প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূল। যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থায় যা থাকা দরকার, তা হলো বিকাশের সবদিক খোলা রাখা। একজন যুক্তিবাদী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান

www.pathagar.com

বিতরণ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টরের কী ধরনের অনুপাত হওয়া দরকার তা নিয়ে অনুশীলন প্রয়োজন। প্রাইভেট সেক্টরকে কীভাবে কার্যকরভাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় তা ভেবে দেখা দরকার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো শিক্ষাখাতকে ব্যবহার করে কীভাবে জনসম্পদ সৃষ্টি করছে, সেই অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই জনসম্পদ দিয়ে তারা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ১১-১২%। গবেষকদের তিনি এ দিকটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি গবেষণাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণধর্মী প্রেসক্রিপশন হিসেবে উল্লেখ করেন। এই গবেষণাপত্রের বহুল প্রচার হওয়া উচিত এবং এর বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সেই বিষয়ে আরেকটু নজরও দিতে হবে।

বেগম মুস্তারী শফি, মানবাধিকার নেত্রী, আহ্বায়ক, ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি, চট্টগ্রাম

প্রস্তাবগুলোর মৌলিক দিক নিয়ে খুব একটা মতানৈক্য নেই, বিশদে কারো কারো মতপার্থক্য থাকতে পারে। এর পক্ষে প্রচারণা দরকার, জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে বাস্তবায়ন সম্ভব। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য তো আজকের নয়, সেই ইংরেজ শাসন থেকেই চলে আসছে। শিশুপাঠেই তো বলা হয়েছে, রাখাল শিশুরা পড়বে না, সকালে উঠে তারা গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাবে, আর ভদ্রঘরের শিশুরা নিজ নিজ পাঠে মন দেবে। এই বৈষম্য আরও বেড়েছে, শিক্ষা এখন বাণিজ্যিক পণ্য। এ ব্যবস্থায় তো মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটে না, ঘটছেও না।

আমাদের দেশে যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে এটি শুধু পরলৌকিকতার কথা চিন্তা করেই চালু হয়নি। এর মধ্যে হয়তো কিছুটা চিন্তাচেতনা বা মানবিক বিকাশের ব্যাপার ছিল, যা বর্তমানে নেই বললেই চলে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষায় ক্ষমতা দখল করার মানসে শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

প্রফেসর রওশন আখতার হামিদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা একটি গবেষণাপত্র রচিত হলে ভালো হয়। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর আমাদের দেশে অত্যন্ত দুর্বল। যার ফলে পরবর্তী স্তরে সুফল পাওয়া যায় না। প্রাথমিক স্তরে যদি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু হয়, তাহলে দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অধিক উৎসাহী হবে এবং সরকারের জন্য এটি একটি সামাজিক বিনিয়োগ হবে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হলে হয়তো একটি মডেলে দাঁড় করানো সম্ভব। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। সেখানে নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ গেলেও কিছু করতে পারে না। এসব কর্মকর্তাদের সরাতে হবে। সকল পর্বেই শিক্ষা হওয়া উচিত সর্বজনীন ও সকলের জন্য উন্মুক্ত, যেমন প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট জানে আলম, সম্পাদক, গণফোরাম, চট্টগ্রাম নগর
বর্তমানে একটা সাংস্কৃতিক সংকট লক্ষ করা যাচ্ছে। আমরা কী পরিবর্তন চাই সেই বিষয়েও নিজেদের ধারণা স্পষ্ট নয়। গবেষণায় বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান পড়া মানেই আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া নয়। কারণ দেখা যায়, একজন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীও গলায় মাদুলি বা তাবিজ পরে ঘুরছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সবকিছু ভাবতে পারে, তাদের সেই শিক্ষা দিতে হবে।

কমরেড শাহ আলম, প্রেসিডিয়াম সদস্য, সিপিবি
শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে হবে। এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট আরও বাড়াতে হবে।

আলী হায়দার, স্টাফ রিপোর্টার, সুপ্রভাত বাংলাদেশ
উপস্থাপিত গবেষণার যেটি দুর্বল দিক, তা হলো— এতে শিক্ষাবিষয়ক ব্যাখ্যা আসেনি। বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ কী হবে বলা হয়নি। সর্বোপরি তিনি বলেন, সমাজের অবস্থা পরিবর্তন না-করতে পারলে এসব গবেষণাপত্র লিখে কোনো লাভ হবে না।

প্রফেসর মোঃ ইসমাইল, যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
শিক্ষক নিয়োগে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা দরকার, যাতে যোগ্য শিক্ষক আসতে পারে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ত্রুটিপূর্ণ, অসংগতিময় এবং অব্যবস্থাপনায় ভরা। প্রশিক্ষণ নিয়েও শিক্ষকরা ভালো শিক্ষাদান করতে পারেন না।

www.pathagar.com

হাসান ফেরদৌস, ব্যুরো চিফ, দৈনিক সংবাদ, চট্টগ্রাম

গবেষণাপত্রটি আমার কাছে অগোছালো মনে হয়েছে। এতে শিক্ষার দর্শনগুলো আলোকপাত করা হয়নি।* শিশুদের সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে।

মোঃ ইদ্রিস, সাংবাদিক

শিক্ষাকে সমকালীন করতে হবে। স্কুলে যে পাঠ্যসূচি আছে, মাদ্রাসাগুলোতে তা চালু করলে শিক্ষার ব্যবধান অনেক কমে যাবে।

শীলাব্রত দাস, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম

অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া কোনকিছুর পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি থাকা উচিত নয়। এমনকি মাধ্যমিক স্তরেও ইংরেজি থাকার ব্যাপারে আমার কিছুটা দ্বিমত রয়েছে।

অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ

দেশের ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানকে সহজভাবে নানা শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের কথা থাকবে, যেখানে নদী-গাছ-পাখি-পাহাড় ইত্যাদির কথা থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারে।

এছাড়া এই কর্মশালার মুক্ত আলোচনায় শিক্ষার্থী, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষানুরাগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যাপক অনুপম সেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপ্রধান প্রথা ভেঙে মুখ্য গবেষক অধ্যাপক অজয় রায়কে সমাপনী বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়ে পরে তাঁর ভাষণ দেন। প্রস্তাবিত শিক্ষা রূপরেখাটিতে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার ও একমুখী শব্দগুলোর ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে, কী অর্থে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজন ব্যাখ্যার, যাতে সাধারণ মানুষ এর নির্যাস বুঝতে পারে এবং সুবিধাবাদীরা এর অপব্যাখ্যার সুযোগ না-নিতে পারে। পরে নিজেই এ সবের ব্যাখ্যা দেন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থার অভাবেই দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ

---

* এ মন্তব্যটি সঠিক নয়। শিক্ষাদর্শন নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমাদের শিক্ষাদর্শনের মূল ভিতটাই হবে মানবিকতাবোধ— 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। শিশুদের সামাজিকীকরণ এর অর্থ কী?

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করছে— তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন। এ ধরনের একটি কাজের জন্য গবেষকবৃন্দ ও আইইডিকে তিনি ধন্যবাদ জানান। প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদেরও তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ড. অজয় রায়, মুখ্য গবেষক

তিনি গবেষকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়া ও অভিমতগুলোর জবাব ও ব্যাখ্যা দেন এবং জানান যে এসব মন্তব্য ও সুপারিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষা আন্দোলন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। সেটি হবে লিঙ্গ ও শ্রেণিভেদে গ্রাম-শহরে একই ধরনের শিক্ষা পৌঁছে দেবার আন্দোলন। একথা মনে রেখেই আমরা একটি সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার ও একই পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনে নেমেছি। অধ্যাপক রায় সভাপতির ভাষণের সূত্র ধরে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার ও একই পদ্ধতির শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন, বিশেষ করে আমাদের লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমিতে।

যশোরে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

৬ মে ২০০৬, 'বাঁচতে শেখা' অডিটোরিয়াম, যশোর

সভাপ্রধান ও সঞ্চালক : অধ্যক্ষ আফসার আলী

জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, অন্যতম গবেষক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী

একটি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আপনাদের মধ্য থেকে যে সুপারিশগুলো পাব, সেগুলো আমরা আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করব। ভবিষ্যতে সরকারকে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করব।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যতম গবেষক

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানেই চরম অবহেলা দেখা যায়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতি উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারে আবার শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতিকে পঙ্গু করে রাখা যায়। আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে।

আমাদের সংবিধান, জাতিসংঘ সনদ এবং ইউনেস্কোর সনদে শিক্ষাসম্পর্কিত যে কথাগুলো আছে, সে অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা বিন্যস্ত করা হয়নি। এসব কথা

www.pathagar.com

মনে রেখে ও অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়েই গবেষণাকর্মটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

হাবিবা শেফা, শিক্ষক ও সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, যশোর

শিক্ষাব্যবস্থায় যে বৈষম্য আছে, তা আমরা পড়াতে গিয়ে বুঝতে পারি। আমাদের পাঠ্যবইয়ের মধ্যে দেখা যায় গ্রাম-শহর, আদিম যুগ-বর্তমান যুগ ইত্যাদি কথাগুলো দিয়ে একটা বিভাজন তৈরি করা হয়। এছাড়া কিছু বাক্য যেমন, আমাদের ধর্ম ইসলাম। এসব বাক্য অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সাধারণীকরণ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় যে বাংলাদেশ একটি ইসলামি দেশ— এখানে অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করে না। এক ধরনের একদেশদর্শিতা সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষিত হয়— ইসলামের নামে ধর্মের নামে। যেমন বর্তমানে নবম-দশম শ্রেণিতেও ১০০ নম্বরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। আবার দেখা যায়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছে তাদের সকলকে ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইসলামি শিক্ষা পড়তে হয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও চিন্তা করতে হবে।

সম্প্রতি বোর্ডের বই ইজারা দেওয়া হয়েছে। ইজারাকৃত কোম্পানিতে প্রকাশক টাকার বিনিময়ে বইয়ের স্বত্ব কিনে নিয়ে আসে। ওই বইয়ের ওপর বোর্ডের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এর ফলে আমার মনে হয় বইয়ের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। এমনকি পাঠ্যপুস্তকে যেসব প্রশ্নপত্র থাকে, তা শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বুঝতে পারে না।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তারা মাতৃভাষা-বহির্ভূত পাঠ্যপুস্তকের সাথে ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। এজন্য তাদের নিজস্ব ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা উচিত। আমার মতে, প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি শিক্ষা থাকা উচিত। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এম আর খাইরুল উমাম, সভাপতি, আইডিইবি, যশোর

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও একটি কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর শিক্ষানীতির বিকল্প নেই। শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা হলেও, প্রাথমিক শিক্ষার মান মোটেও ভালো নয়। সরকার দাবি করে, প্রতিবছর তারা দেড় কোটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। তবে দেখা যায় যে, এসএসসি পরীক্ষায় পনেরো লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে না। এই দেড় কোটি থেকে পনেরো

www.pathagar.com

লাখের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে, তার কারণ অনুসন্ধান করে সেই বিষয়গুলোর ওপর জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে অনেকে ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। আমি মনে করি, প্রথমে মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে শিখতে হবে তারপরে ইংরেজি।

সারা জীবনই শিক্ষা অর্জনের সময়। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণাটি স্থায়িত্ব লাভ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর যারা মাধ্যমিক কিংবা মাধ্যমিকের পর যারা উচ্চ-মাধ্যমিকে ভর্তি হবে না, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। তিনি জোর দেন, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের গুণগত প্রশিক্ষণ, সকল স্তরে একই পদ্ধতির শিক্ষা এবং শিক্ষা সংস্কারে জনগণের সম্পৃক্ততার ওপর।

সুকেশ জোয়ার্দার, সহকারী অধ্যাপক, মাহতাবউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ, ঝিনাইদহ

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। গবেষণায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নীতিশিক্ষা অন্তর্ভুক্তের কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি, ৪র্থ শ্রেণি থেকেই নীতিশিক্ষা থাকা উচিত। ধারণাপত্রে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে যে মানবন্টনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষায় সবাইকে কিছু বাধ্যতামূলক বিষয় পড়তে হয়, কিন্তু মানবিকের ক্ষেত্রে সেটি নেই।* মানবিক শাখায় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করার জন্য অনুরোধ করছি।

২য় শ্রেণি থেকেই ইংরেজি থাকা দরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ২০০ নম্বর করে ইংরেজি রাখা উচিত। ইংরেজি শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষকের অভাব— এ সমস্যা দূরীকরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধিসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করতে হবে।

ফিরোজা বুলবুল, সহকারী অধ্যাপক, মনিরামপুর ডিগ্রি কলেজ

দেখা যায়, এলাকার প্রভাবশালী, শিক্ষিত নয় এমন ব্যক্তিরাই স্কুল পরিচালনা কমিটিতে থাকছেন এবং তাদের অনেক অন্যায় কার্যকলাপও শিক্ষকদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। শিক্ষক-পরিচালনা কমিটিতে যারা আসবেন, তাদের ন্যূনতম

---

* এই পর্যবেক্ষণ ঠিক নয়। সকল শাখার জন্য বাধ্যতামূলক ৪টি বিষয় রয়েছে ৪৫০ নম্বরের কোর কোর্স। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য রয়েছে বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস, বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস, আর বাণিজ্যের ছাত্রদের নিতে হবে এর যেকোনো একটি। (সারণি ৩.২)

www.pathagar.com

শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের এসব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এইচ আর তুহিন, সাংবাদিক, দৈনিক যুগান্তর

পুস্তক নিয়ে যে বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে সেটি বন্ধ করতে হলে শিক্ষাবোর্ডকে সহপাঠগুলো নির্ধারণ করে দিতে হবে। আজকাল কোচিংমুখী বিদ্যাচর্চা দেখা যায়। যার যত টাকা আছে, সে সন্তানকে তত ভালো শিক্ষকের কাছে নিয়ে প্রাইভেট কোচিং দিতে পারছে। এতে শিক্ষা হয়ে পড়ছে ধনীক শ্রেণির। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

মুজিবুদ্দৌলা সরদার, নির্বাহী পরিচালক, সুসমাজ ফাউন্ডেশন

শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী ছেলেমেয়েরা যাতে আসতে উৎসাহী হয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে দেখা যায়, যে প্রকাশক যত বেশি বিজ্ঞাপন এবং কমিশন দিতে পারে তার বই বাজারে তত বেশি চলে। এসব বইয়ের গুণগত মান বিচার না-করেই শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হয়। নোট ব্যবসায়ীদের এসব দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে।

ফখরে আলম, কবি ও ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক

বর্তমানে কিছু শিক্ষক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। নীতি-বিবর্জিত এসব শিক্ষক শিক্ষার মানকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এদেশের উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো কৃষি। এজন্য কৃষিভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলো বিশদভাবে আনতে হবে এবং এসব তথ্যের স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

সুকুমার দাস, অধ্যাপক, বাঘাপাড়া ডিগ্রি কলেজ ও সাধারণ সম্পাদক, উদীচী-যশোর

উপজেলাগুলোতে ৫-৭ বছর আগেও ১-২টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ ছিল। বর্তমানে সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ১২-১৪টি করে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নেই, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও খুবই নগণ্য। কেবল সরকারি অনুদান পাওয়ার আশায় এসব কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামে যেখানে এসএসসি পাসের হারই অত্যন্ত কম থাকে, সেখানে কলেজে ভর্তির জন্য এত শিক্ষার্থী কোথা থেকে আসবে? এই বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

জেমস রোজারিও, অধ্যক্ষ, সিসিটিএস

শিক্ষা-বিষয়ক নানা কর্মশালা হয় এবং সেখানে অনেক সুন্দর কথা উত্থাপিত হয়। আপনাদের কৌশলপত্রেও অনেক সুন্দর কথা রয়েছে এবং এখান থেকে অনেক সুপারিশও আসবে। আমি ধরে নিলাম এই সুপারিশগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে একটা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকারকে দেওয়া হলো এবং সরকার সেটি গ্রহণ করল। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই নীতিমালা কার্যকর করার দায়িত্ব কাদের ওপর বর্তাবে? নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মনিটরিং ও ইভালুয়েশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যারা সরকারি খবরদারিকে তোয়াক্কা করবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, অভিভাবকদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর একটি বড় কারণ হলো— শিক্ষিত হয়ে তারা চাকরি করবে। আসলে শিক্ষার্থীদের মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করার পাশাপাশি কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।

মাহবুবুর রহমান মজনু, সাধারণ সম্পাদক, টিইউসি

শিক্ষার সব সেক্টরই দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এসব দুর্নীতি রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে। আমাদের শিক্ষকরা পড়াশোনার চেয়ে অন্যান্য কর্মকাণ্ডেই বেশি ব্যস্ত থাকছেন। দেখা যায়, ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯০ জনই বই পড়েন না।

তিনি আরও বলেন, পেশাগত কর্মের একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার। জনসংখ্যার সাথে সমন্বয় করে কতজন শিক্ষিত কৃষক, কতজন ড্রাইভার ইত্যাদি হবে এ বিষয়গুলোর একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এছাড়া শিক্ষিত জনগণকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর ইমামতি পেশা গ্রহণ করছেন। এদেরকে বিভিন্ন মিলাদ-মাহফিলে ডাকা হয় এবং সেখান থেকে যা পান তা দিয়ে কোনোরকমে তারা জীবনযাপন করেন। ফলে এরা উৎপাদনের সাথে যুক্ত হন না। এদেরকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মানবন্টন সম্পর্কে তিনি বলেন, শিষ্টাচারের জন্য ৫০-১০০ নম্বর থাকা উচিত। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

www.pathagar.com

অ্যাঞ্জেলা গোমেজ, নারীনেত্রী ও নির্বাহী পরিচালক, বাঁচতে শেখা, যশোর
বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণ শেষে শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে। অথচ এদেরকে আমরা উৎপাদন কর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পারছি না। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়— এ বিষয়গুলো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অবহিত করে তাদেরকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে।

গোলনাহার বেগম, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি মহিলা কলেজ
'আমরা কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই'— এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করছে। সমীক্ষার ধারণাপত্রে যে নীতিশিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে দেশপ্রেম অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। নীতিশিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ধর্মের বিরোধী নই।' ধর্ম একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। এটি কচিমনের শিশুদের ওপর আরোপ করা যায় না। ধর্মীয় শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। অনেক শিক্ষক ধর্ম পড়াতে গিয়ে নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা দেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের মনে উগ্রবাদী ধারণার জন্ম হয়। এজন্য ধর্মকে স্কুলে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না করাই উচিত।

সন্তোষ হালদার, অধ্যক্ষ, অক্ষর শিশু শিক্ষালয়
শরীরচর্চা, যৌনশিক্ষা, নাগরিক অধিকার এই বিষয়গুলো পাঠক্রমে থাকা দরকার। এই শিক্ষানীতি কাদের দ্বারা কার্যকর হবে তার একটা নির্দেশনা থাকা দরকার।

আফসার আলী, সাবেক অধ্যক্ষ, এস এস কলেজ
শিক্ষা উৎপাদনমুখী হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করেছে, এটি বাস্তবায়ন কে করবে? আমি বলব, এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনার, আমার, সকলের। আমি এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতি নই।

বরিশালে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

১২ মে ২০০৬, বিডিএস অডিটোরিয়াম, বরিশাল
সঞ্চালক : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিবিদ নিখিল সেন

নুমান আহম্মদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি
কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন তিনি। তিনি বলেন, শিক্ষা একটি মৌলিক বিষয়। দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, সে

www.pathagar.com

তাগিদেই এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। সমীক্ষাপত্রে যাতে সারাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে, সেই লক্ষ্যে দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সমাজ ও দেশ উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই যেখানে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী এবং চারিত্রিক-দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতি হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু অপূর্ণাঙ্গতা থাকার ফলে সেটি নিয়ে 'মানি না,' 'চলবে না'— এ ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান তৈরি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায়, তাহলে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজটি হাতে নেওয়া হয়েছে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যুক্তিবাদী, মানবতাবোধসম্পন্ন, বহুত্ববাদী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ তৈরির প্রত্যাশা নিয়ে পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

রাবেয়া খাতুন, সাবেক প্রধান শিক্ষক, সরকারি বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয়, বরিশাল

গবেষণায় যে বিষয়গুলো আসেনি এবং যা আসা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি সেগুলো আমি আলোচনা করব। পথশিশুদের কথা গবেষণায় আসেনি। পথশিশুরা এমনি একটা পরিবারে জন্ম নেয়, যাদের খুব ছোটবেলা থেকেই উপার্জন করতে হয়। এসব শিশুর জন্য যদি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে তারা নিজেরা শিখবে এবং উপার্জন করবে, তাহলে সেটা সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর হবে। জেলখানায় যেসব মহিলা কয়েদি রয়েছে তাদের সন্তানদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণায় extra-curiculam কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমানে একে co-curiculam নামে ডাকা হয়। শিশুদের ওপর পড়াশোনা চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা মোটেও উচিত নয়। শিক্ষকদের দক্ষতা ও নৈতিকমান উন্নত হতে হবে, কারণ তাদের এই গুণগুলো শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চালিত হবে। এছাড়া শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমিনুল হক, সাবেক অধ্যাপক, সরকারি বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বরিশাল

শিক্ষার ক্ষেত্রে সমঅধিকার থাকতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ১ম-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক ৯ম-১২শ শ্রেণি পর্যন্ত হওয়া উচিত। সকল ধর্মের মূলনীতি নিয়ে সর্বজনীন একটা ধর্মীয় শিক্ষা হতে পারে।

প্রফেসর মোঃ হানিফ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

গবেষণাপত্রের খুব বেশি সমালোচনার কিছু নেই। তবে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ছে একদিকে, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার

www.pathagar.com

মান দিন দিন কমছে। বড় সমস্যা হলো, প্রাথমিক শিক্ষাও উচ্চশিক্ষার মতো পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষণ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেদেরকে যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত করেন না। অনেক শিক্ষকই দেরিতে ক্লাসে আসেন এবং তাড়াতাড়ি চলে যান। এর অন্যতম কারণ হলো দায়িত্ব সম্পর্কে নিষ্ঠার অভাব। বর্তমানে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এতে করে ধনিক শ্রেণির অমেধাবীরা এ পেশায় প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রক্রিয়াটিকে আমিও সমর্থন করি, তবে এটি ধীরে ধীরে করতে হবে। কারণ, বর্তমানে এ স্তরে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের অনেকেই এসএসসি পাস। ফলে তাদের পক্ষে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। একই কথা মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নত দেশে শিক্ষা ৪ বছর থেকে শুরু হয়। এটাই বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে স্বীকৃত। এজন্য আমি মনে করি, প্রাক-প্রাথমিক ৪ বছর থেকে শুরু হতে পারে। মূল যে কথাটি তা হলো, শিক্ষকের মান না-বাড়ালে শিক্ষার মান বাড়বে না। ম্যানেজিং কমিটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষিত লোকের কমিটিতে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায়, ক্ষমতার দাপটে অশিক্ষিত লোকেরা কমিটির সদস্য হচ্ছেন। এজন্য ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। গবেষণায় এই বিষয়টির একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল। বিষয়টি আমি সুপারিশমালায় রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

গবেষণাপত্রে বৈষম্যহীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এটি করতে হলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, মানসিক অবস্থা, মেধা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্দেশনা দেওয়া দরকার। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের একটি ভূমিকা থাকা উচিত। ৫ম শ্রেণি থেকে আইটি শিক্ষা থাকা উচিত এবং উচ্চশিক্ষা হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক মানের।

ফয়জুন্নেসা শেলী, শিক্ষক, মথুরানাথ পাবলিক হাইস্কুল

প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি কীভাবে হবে সেই বিষয়ে নির্দেশনা থাকা দরকার। বিভিন্ন সরকারের আমলে শিক্ষা কমিশন করা হয়, কিন্তু কোনোটিই কাজে আসেনি। সুশীল সমাজের সমন্বয়ে একটা সুদূরপ্রসারী শিক্ষা-কমিশন গঠন করতে হবে।

শিক্ষকদের পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে সৃজনশীল শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে যে গ্রেডিং সিস্টেম চালু হয়েছে তাতে দেখা যায় পড়াশোনার পদ্ধতি না-বদলিয়ে কেবল ফলাফলের পদ্ধতি বদলানো হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং মর্যাদাগত কারণে মেধাবীরা এ পেশায় আসার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

www.pathagar.com

জীবন কৃষ্ণ দে, সভাপতি, খেলাঘর, বরিশাল শাখা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দরকার আছে, তবে বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন যেভাবে চালানো হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে যারা ঝরে পড়ে তাদের বিষয়েও একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার।

আশীষ দাশগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক, চৈতন্য উচ্চ-বিদ্যালয়

বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, আমি সেটিই চাই কারণ বড় কিছু চাইতে গিয়ে শেষে কিছুই পাব না। এদেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা কোনোকালেই ছিল না, তারপরও আমরা অনেকেই সংস্কৃতিমনা, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছি। সর্বস্তরের শিক্ষার যে ধস নামানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইংরেজি শিক্ষা ৫ম শ্রেণি থেকে থাকা উচিত।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সভাপতি, বরিশাল থিয়েটার

গবেষণায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' না-বলে 'অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা-চেতনা' সংযোজন করার জন্য সুপারিশ করছি। যে ধরনের ডে-কেয়ার সেন্টার চালু আছে, তা বিত্তশালী সুবিধাভোগীদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, দরিদ্র মানুষের সন্তানরা সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। গবেষণায় বলা হয়েছে, 'সংখ্যালঘুদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা'।* সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু বলতে আসলে কিছু নেই।

হিরণ কুমার দাস মিঠু, অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, বরিশাল

স্বাধীনতার পর যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেটি বাস্তবায়ন করতে পারলেও দেশ অনেকদূর এগিয়ে যেত। আজকে আমাদের কোমলমতি শিশুদের মনে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেবল ত্রুটিগুলো না-ধরে আমাদের জাতি গড়ার আন্দোলন করতে হবে। শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের দক্ষতার মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

---

* পর্যবেক্ষণটি ঠিক নয়। সংখ্যালঘু বলা হয়নি— বলা হয়েছে, অবাংলাভাষী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের জন্য যতদূর পারা যায় প্রাথমিক পর্বে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ দিতে হবে। (সারণি ৩.১)

www.pathagar.com

প্রশান্ত ঘোষ, সাংবাদিক

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত।* শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আনা, কর্মজীবীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা, পাঠ্য উপকরণ, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা এসবের ওপর তিনি জোর দেন।

হাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, আইআরডি

'আমরা কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই'— এর উত্তরে বলব, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চাই। বর্তমানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের দেশে নানা অপসংস্কৃতি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে। শিক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

আনোয়ার জাহিদ, রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজসেবক

এখন শিক্ষকতা পেশার স্বরূপটি এমন হয়ে গেছে যে— 'যার নাই কোনো গতি সে করে মাস্টারি'। শিক্ষকরা যে শিক্ষাদান করেন না, তার জন্য শিক্ষকদের চেয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাই বেশি দায়ী। শিক্ষকরা যে সম্মানী পান তা ভদ্রভাবে চলার জন্য যথেষ্ট নয়। একদিকে আমরা ধনিক শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করছি, অন্যদিকে যে শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করছি তাতে ধনিক শ্রেণিরই পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এজন্য আমি মনে করি, এই গবেষণাপত্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মেধাবীদের এ পেশায় আসার জন্য উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিক্ষানীতি যারা বাস্তবায়ন করবে, তাদের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর উপস্থিতি দরকার ছিল।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, অন্যতম গবেষক

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলের বক্তব্যের মধ্য থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে, যা আমাদের গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আমাদের কাজটি হাতে নেওয়ার কারণ হলো, অন্তত শিক্ষা নিয়ে যারা চিন্তা করছে, সেসব অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত বা চিন্তাগুলো সংগ্রহ করা এবং তা গ্রন্থিত করে প্রকাশ করা।)

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

১৭ মে ২০০৬, স্বপ্নীল কমিউনিটি সেন্টার, রাজশাহী

সভাপ্রধান : অধ্যাপক জুলফিকার মতিন

---

* এ দ্বারা ঠিক কী বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

www.pathagar.com

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, অন্যতম গবেষক

তিনি খসড়া প্রস্তাবের মূল দিক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বল্প কথায় তুলে ধরেন। গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত আমাদের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে যে অঙ্গীকার রয়েছে, সেটি এবং পাশাপাশি বৈষম্যহীন শিক্ষার ওপর জাতিসংঘের সনদ।

ড. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণাপত্রে শিক্ষাদর্শনের কথাগুলো খুব সুন্দরভাবে এসেছে এবং প্রস্তাবিত শিক্ষার মূলগত বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে এসব বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে তার অবশ্য পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য একটি আন্দেলন গড়ে তোলা দরকার।

হাসান ইমাম, অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণাপত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল, পাশাপাশি অন্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র উত্থাপন করলে ভালো হতো। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে তা অনুপস্থিত। ছেলেমেয়েদের ওপর শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে স্বচ্ছ চিন্তার পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার সুপারিশ বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ, আমরা কি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রস্তুত? তবে একথাও বলতে হবে যে মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার অর্থ ধর্মের বিসর্জন নয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার কি উচ্চশিক্ষায় সম্ভব? মাধ্যমিক স্তরে ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষা কি তুলে দেওয়া যায়?

অধ্যাপক মিজান উদ্দীন, সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাদর্শন নিয়ে আরও গভীরে গেলে ভালো হয়, এর সাথে যুক্ত হওয়া উচিত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। লক্ষ রাখতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ দুটিই যেন স্থান পায়। অর্থনীতির সাথে শিক্ষার সম্পৃক্ততা থাকা প্রয়োজন, তবে মুক্তবাজার অর্থনীতি মানুষকে সেই সাথে শিক্ষাকেও পণ্যে পরিণত করেছে।

শফিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ

প্রস্তাবিত বিকল্প শিক্ষা রূপরেখায় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি চালু হলে মাদ্রাসা থেকে শুরু করে যত

www.pathagar.com

ভিন্নপথের শিক্ষা আছে, তার আর প্রয়োজন থাকবে না। এটি একটি ইতিবাচক দিক। স্কুল ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা উচিত হবে। বিভাগে বিভাগে শিক্ষাবোর্ড না-রেখে, প্রতিটি জেলাতেই শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। শিক্ষা প্রশাসনকে যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। একাডেমিক ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে শিক্ষাবিদদের হাতে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি থাকবে, যার কাজ হবে শিক্ষার মান ও অন্যান্য বিষয় পর্যবেক্ষণ। বেসরকারি-সরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বেতন কাঠামোয় কোনো তারতম্য থাকবে না।

জয়তুনা খাতুন, সমাজসেবী

শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপ, শিশু শ্রমিক, পথশিশু, ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের কীভাবে শিক্ষায় নিয়ে আসা যায়, তার জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

বুলবুলি রানী ঘোষ, শিক্ষিকা, সংস্কৃত কলেজ, রাজশাহী

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক মধুর করতে শিক্ষাকে চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমের সাথে মেশাতে হবে। সংস্কৃত শিক্ষাকে কীভাবে মূল শিক্ষাস্রোতে আনা যায়, গবেষণায় সে সম্পর্কিত বাস্তব সুপারিশ আশা করছি।

আবুল হোসেন, ভাষা সৈনিক, শিক্ষাবিদ

তিনি সংশয় ব্যক্ত করে বলেন, নতুন চিন্তায় উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা আবার নতুন ব্যবধান সৃষ্টি করবে না তো? তিনি প্রশ্ন করেন, গবেষকদের কি গ্রামের সাথে শহরের স্কুলের যে বৈষম্য রয়েছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, নাকি কাগুজে অভিজ্ঞতা? আপনারা কি কোনো গ্রামের স্কুল দেখেছেন? বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, কাদেরকে দিয়ে করাবেন?

অনিরুদ্ধ, সাংবাদিক

তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা, 'ঝরে পড়া' সমস্যা, সাক্ষরতা, শিক্ষার মান নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন।

অ্যাডভোকেট সামাদ

মানবতাবোধ সৃষ্টি মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

ড. অজয় রায়, মুখ্য গবেষক

তিনি প্রস্তাবিত শিক্ষার নানা দিক নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন এবং উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উপরও আলোকপাত করেন। তিনি স্বীকার করেন যে শিক্ষার বাহন নিয়ে বাংলার ভূমিকা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মতভেদ রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব কতটা থাকবে এবং কোন শ্রেণি থেকে শিশুদের ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত করা উচিত সে বিষয়ে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এসব প্রশ্নের অনেক উত্তরই পাওয়া যাবে মূল প্রতিবেদনটিতে।

অধ্যাপক জুলফিকার মতিন, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপ্রধানের বক্তব্যে তিনি বলেন, এমন একটি মহৎ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আইইডি ও গবেষকদের ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও জানান যে, আমাদের অনেক সৎ চেষ্টাই শেষতক সফল হয় না, এজন্য হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চেষ্টা আমাদের চালিয়েই যেতে হবে— এর মধ্য দিয়েই হয়তো একদিন সত্যিকারের সেক্যুলার ও সর্বজনীন শিক্ষা আমরা পেয়ে যাব।

সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

৩১ মে ২০০৬, পৌরসভা মিলনায়তন, সিরাজগঞ্জ

সভাপ্রধান ও সঞ্চালক : শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ইসলাম

অধ্যাপক শামসুল আলম ও উত্তরণ মহিলা সংস্থার পরিচালক সাফিনা লোহানীর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া কর্মশালায় গবেষক অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম সংক্ষেপে গবেষণা সম্পর্কে ধারণা দেন এবং কী কারণে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয় তা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, আমাদের আজকের শিক্ষা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষা কেবল চেয়ার-টেবিল বা দালান-কোঠা নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিকবোধ জাগ্রত করার পন্থা থাকা দরকার, যা বর্তমানে নেই বললেই চলে। তাই বিভিন্ন শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ কী ধরনের শিক্ষা চায়— এই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়েই আমরা গবেষণাটি শুরু করেছি।

উদয় পাল, সিরাজী রোড, সিরাজগঞ্জ

প্রতিবছর আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তাদের সবাই পঞ্চম শ্রেণি পাস করতে পারে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে এক কোটি বিশ লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এবং তার মধ্যে ২৯-৩০% শিশু ঝরে পড়েছে : তার মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ ষষ্ঠ এবং

www.pathagar.com

মাত্র ৭-১০ লক্ষ এইচএসসিতে ভর্তি হয়। এর মধ্যে আবার মাত্র ৫০-৫৭% পাস করে। এরপর যারা থাকে, তাদের মধ্যে সব মিলিয়ে মাত্র সাড়ে তেরো হাজার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। অর্থাৎ দেখা যায়, যত শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল তার মাত্র ০.৩% শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আবার এরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর চাকরি লাভ করতে পারছে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার এতগুলো স্তর পার করে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে তারা বেকার কেন?

যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তারা নিম্নবিত্তের সন্তান নয়। কারণ বর্তমানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে যেভাবে প্রস্তুত হতে হয়, সেভাবে প্রস্তুত করা একজন নিম্নবিত্ত অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব নয়।

যতই আমরা শিক্ষানীতি নিয়ে কর্মশালা করি না কেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি অর্থবহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। অর্থনীতির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়, কিন্তু এই গবেষণাটিতে অর্থনীতির বিষয়ে অলোকপাত করা হয়নি। একজন দরিদ্র কৃষক তার সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করাকে বেশি লাভজনক মনে করে।

আব্দুল হালিম খান, শিক্ষক

আজকাল উচ্চশিক্ষা লাভ করেও অনেকে চাকরি পাচ্ছে না। এতে করে অভিভাবকদের অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আমার কাছে মনে হয় গুণগত শিক্ষার অভাব। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত করা উচিত এবং এটি হবে বাধ্যতামূলক, একমুখী এবং অবৈতনিক। শিক্ষা হওয়া উচিত কর্মমুখী।

টি. এম সোহেল, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ

বর্তমানে শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েও অনেকে জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। মানুষকে ভালো রাখতে পারে এবং তাদের মধ্যে মানবিক বোধ সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। গবেষণায় যে 'বৈষম্যহীন' শব্দটি বলা হয়েছে তা ঠিক আছে, তবে কারিকুলাম এক হলেও বৈষম্য থেকে যায়। যেমন, একই কারিকুলামে একজন এসি রুমে বসে শিক্ষা গ্রহণ করছে, আর অন্যজন ভাঙা বেঞ্চে বসে শিক্ষা গ্রহণ করছে। আবার শহরের শিক্ষার্থীরা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, যা গ্রামের শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকেই যায়। এজন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি দরকার।

www.pathagar.com

একজন ভালো শিক্ষক ভালো শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত। ভালো শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে পারলে ভালো শিক্ষাদানও অনেকাংশে নিশ্চিত করা যাবে।

মুস্তফা কামাল, সাংবাদিক

গবেষণার বিষয়টি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের স্বার্থের সাথে যুক্ত। কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই— তা বাস্তবায়নের দাবি আমাদের সকলের। তবে এজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার এবং সমাজের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য আরও উদ্যোগী হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সকলের প্রাণের দাবি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের দিকে জোরালোভাবে নজর দিতে হবে। শিক্ষার জন্য জীবন নয় বরং জীবনের জন্য শিক্ষা— এই বোধ জাগ্রত হতে হবে।

ডা. জহিরুল হক রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিরাজগঞ্জ কমিউনিটি হাসপাতাল

দেশের সকল মানুষকে এখনও পর্যন্ত শিক্ষার আওতায় আনা যায়নি— বিষয়টি আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি প্রায় ৭০% মানুষের অনীহা দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো— শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলো আমাদের বের করতে হবে এবং গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে হবে। এখন বাকি যে ৩০% থাকে তারাও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। শিক্ষার উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ তা জাতির খুব একটা কাজে আসছে না। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না বলেই কর্মস্থলে গিয়ে সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারে না।

মোঃ আখতারুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামিয়া সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ

একজন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যে খরচ হয়, তা দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতি বছর সরকার বলে থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি, কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে, এই খাতে দুই শতাংশের বেশি ব্যয় হয় না। তারপরও যারা শিক্ষা লাভ করে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না। আমাদের দেশের সরকারের শিক্ষানীতির সাথে কর্মসংস্থানের যোগসূত্র দেখা হয় না। গবেষণায় অর্থনৈতিক দিকগুলো আনা হয়নি, যা যুক্ত হওয়া দরকার ছিল।

প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের পর যাদের সংগতি নেই তাদের জন্য সরকারের শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করা দরকার। শিক্ষা শেষ করার পর চাকরি না-হওয়া পর্যন্ত সরকারের দায়বদ্ধতা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

নবকুমার, বাসদ নেতা

আমাদের দেশের সবকিছু রাজনীতিকৃত হয়ে পড়ে। আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত শিক্ষাব্যবস্থা পাইনি। তাই তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, হয়তো এই শিক্ষা কার্যক্রমটির কোনো বাস্তবায়ন হবে না। তিনি বলেন, এই গবেষণার সাথে আমার খুব একটা দ্বি-মত নেই, তবে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, অথচ গবেষণায় মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবনা নেই।*

অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম তালুকদার, পাবলিক প্রসিকিউটর, সিরাজগঞ্জ জজ কোর্ট

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক স্লোগান উচ্চারিত হলেও বাস্তবে কোনোটিই কার্যকর হয় না। এগুলো কার্যকরের জন্য রাজনৈতিক কমিটমেন্ট এবং ত্রুটিগুলো শুধরানোর মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালুর পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

সুকুমার দাস, অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ

অন্য দেশের দিকে না-তাকিয়ে নিজ দেশ ও সমাজের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের দেশে এখনো অনেক কমিটেড শিক্ষক রয়েছেন, যারা শিক্ষার্থীদের বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং মনের তাড়না থেকেই শিক্ষাদান করে থাকেন। এ ধরনের শিক্ষকদের খুঁজে বের করে তাদের মতামত সংগ্রহ করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে সেটি আরও কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি। নারীশিক্ষার বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা থাকবে বলে আশা করি।

নুরে আলম হিরা, শিক্ষক, সবুজকানন হাইস্কুল, সিরাজগঞ্জ

আমাদের দেশে শিশুরা ৫-৬ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়। এর আগে তারা মায়ের কোলে থাকে এবং পরিবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্য আমি মনে করি, প্রথমে মায়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, অনেক বিষয় পড়ানো হয়, যেগুলো বাস্তব জীবনে কোনো কাজে আসে না। সেগুলো পরিহার করা উচিত। বাস্তব বা জীবনমুখী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

---

*এ মন্তব্যটি ঠিক নয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আমরা উৎসাহিত করিনি। কিন্তু এর অস্তিত্ব একটি বাস্তবতা। বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তর বিশ্লেষণ করেছি। এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ রয়েছে।

www.pathagar.com

লুৎফুন্নেসা, অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, সিরাজগঞ্জ
স্কুলে বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার চেয়ে পরিবারে সঠিক সময়ে বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের সচেতন করা দরকার এবং এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের নারীশিক্ষা বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা

২৮ জুন ২০০৬, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা
সভাপ্রধান : শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান
সঞ্চালক : নারীনেত্রী রোকেয়া কবীর

রোকেয়া কবীর, নির্বাহী পরিচালক, বিএনপিএস এবং উপদেষ্টা, আইইডি
অতীতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য। এ নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও করেছে রাজপথে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থাটি যেন সমন্বয়হীন হয়ে পড়েছে, ফলে শিক্ষার মান এখন অধোমুখী। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষ করে বের হয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু এর স্বল্প অংশই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছে। এসব সমস্যা মাথায় রেখেই একটি প্রত্যাশানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য এই গবেষণা কাজটি আমরা হাতে নিয়েছি। আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে শিক্ষার্থীরা যুক্তির মধ্য দিয়ে গুণগত মানসম্পন্ন এবং মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরি হতে পারে।

নুমান আহম্মদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি
আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে নুমান আহম্মদ খান উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গুণগত মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমাদের এই উদ্যোগ।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, অন্যতম গবেষক
শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরণের মধ্য দিয়েই মানব সভ্যতার উত্তরণ ঘটেছে। শিক্ষাই হলো সকল উন্নয়নের চাবি। এ কারণে এর মানোন্নয়ন বেশ জরুরি। সর্বমহলের কাছে

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা এ কাজটি হাতে নিয়েছি। এ পর্যন্ত যত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনটিই সর্বোত্তম এবং জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ। জ্ঞাত কারণেই '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো প্রতিবেদনটিকে হিমাগারে পাঠায়। উক্ত কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সেটি আর হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ এবং এ স্তরের শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সব উন্নত দেশেই আঠারো বছর পর্যন্ত প্রতিটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে রাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী সরকারকে এই দায়িত্ব পালনে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রস্তাবে মূলধারার বাইরে আরেকটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এটি বৃত্তিমূলক। আমাদের প্রয়াস একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এজন্য সকলের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

আয়েশা খানম, সাধারণ সম্পাদক, মহিলা পরিষদ

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আইইডিকে ধন্যবাদ। ড. অজয় রায় ও শহিদুল ইসলাম গবেষণাপত্রে কিছু কথা বলেছেন, যা অনেকটা স্বপ্ননির্ভর। পাঠ্যসূচির বিষয় নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। যেমন, মানবতা ও মানবাধিকার এ দুটি বিষয়কে অলাদা করা উচিত। লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা উচিত। সব ব্যাপারেই পশ্চিমকে অনুসরণ না-করে দেশজ সংস্কৃতির আলোকে আমাদের বিষয়গুলো দেখতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। শিক্ষাদর্শনে লোকজ বিষয়টিকে আনতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অন্তরায়, তবু দাতারা এর জন্য অর্থ যোগাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে।

ড. মশিউর রহমান, সাবেক সচিব ও অর্থনীতিবিদ

সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হলেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন নয়, গণমুখীনও নয় এবং সমাজের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এই দৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের বোঝা এবং এটি অবশ্যই অচল। গবেষণায় নীতি ও ধর্মের কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা আর নীতিশিক্ষা এক নয়। শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ২২% ব্যয় করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের নামে। এই ব্যয় সাধারণ শিক্ষায় করলে অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করতে পারত। সংবিধানের ৪১ নম্বর ধারায় প্রতিটি ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর কথা বলা হলেও সরকার কেবল মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে— এটি সংবিধানসম্মত নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

পরিচালনায় যে পদ্ধতি চালু আছে, তাতে স্কুল কলেজগুলোর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে ষোলো আনা।

কাজী ফারুক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থাটি চালু আছে এর পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এ কারণে গবেষকদের শ্রমদান উৎসাহব্যঞ্জক। শিক্ষা কেবল অকাশচারী স্বপ্নের ব্যাপার নয়, অনেক ভালো ভালো কথা আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু আমাদের হতে হবে অনেকটা প্রয়োগবাদী। শিক্ষা একটি প্রায়োগিক ব্যাপারও। নানা শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি একক ব্যবস্থার মধ্যে আনার গবেষকদের চেষ্টা প্রশংসনীয়— তবে এটি কেবল স্থানীয় সমস্যার দৃষ্টিতে করলে চলবে না, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যাচাই করে দেখতে হবে। কারণ গবেষকরাই বলেছেন শিক্ষা একটি বৈশ্বিক ব্যাপারও বটে, যাকে বলা যায় সর্বজনীন।

ড. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনেক কিছু আমরা চাই না, কিন্তু কী চাই— সে বিষয়ে আইইডি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। গ্রামগঞ্জে অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেক ভালো জ্ঞান রাখেন। তাদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। কী ধরনের শিক্ষা চাই— প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ধাপগুলোকে চিহ্নিত করে, প্রতিটি ধাপে কী করা হবে এর সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকতে হবে। ৩য় শ্রেণি থেকে ইংরেজি শুরুর পরিবর্তে ১ম শ্রেণি থেকেও তা শুরু করলে অসুবিধা নেই। কারণ শিশুরা তাড়াতাড়ি অনেক কিছুই শিখতে পারে। আইটি শিক্ষা পরে দিলেও চলতে পারে, এর চাইতে বরং গণিতে আরও গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। যেখানে সুবিধা সৃষ্টি করা যেতে পারে, সেখানে কম্পিউটারকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে নানা বিষয়ে সুন্দরভাবে শেখানো যায়, যা অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে দেওয়া যায় না। প্রাইভেট শিক্ষা'র অভিভাবকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধান বের করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ডিগ্রি কোর্স শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে গবেষকদের। এটিকে যদি প্রান্তিক বা সমাপ্তি ডিগ্রিরূপে বিবেচনা করা হয়, তাহলে যেকোনো চাকরিতে ঢোকার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মাস্টার্স ডিগ্রি বাধ্যতামূলক না-করে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

রাশেদা কে. চৌধুরী, পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রস্তাবনার সাথে অনেক ক্ষেত্রে খুদা কমিশনের মিল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এটি ভালো দিক অবশ্যই। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পরিবেশটি হতে হবে স্নেহময় ও বন্ধুসুলভ। বর্তমানে এটির বড্ড অভাব। এমনকি শিশুদের শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয় স্কুলে। এছাড়া পাঠ্যবিষয়ের আয়তন বিপুল হওয়া শিশুর মনের ওপর একটি বোঝাস্বরূপ। এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে গবেষকদের এবং উপায়ও খুঁজে বের করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়া যায় না। গাজীপুরে একটি মেয়েদের মাদ্রাসায় সম্প্রতি একটি জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, অনেক মেয়ে ভবিষ্যতে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার কথা ভাবছে, অথচ ওই মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষাই দেওয়া হয় না। শিক্ষার নানা দিকে বৈষম্য বাড়ছে, শিক্ষা ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি আরও উঁচু শ্রেণি থেকে পড়ানো শুরু করা উচিত, অভিভাবকদের সাথে আলোচনা না-করে কোনমতেই ইংরেজি ৩য় শ্রেণি থেকে শুরু করা উচিত হবে না।

নূরুল ইসলাম নাহিদ, রাজনীতিবিদ

অনেকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষাকাঠামো তৈরি করতে হবে। যাতে যেকোনো দলের সরকার এটিকে বাস্তবায়ন করতে পারে। বর্তমান উদ্যোগটি সেই লক্ষ্যে একটি ভালো পদক্ষেপ। শিক্ষক সমিতিগুলোর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় আসা যেতে পারে। সুন্দর একটি শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রত্যয়।

সঞ্জীব দ্রং, আদিবাসী নেতা, লেখক

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা আমরা এখনো পাইনি। অধ্যাপক রায় ও শহিদুল ইসলাম একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস নিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ, এর সাথে আইইডিকেও। আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের সম্মানের চোখে দেখাতে শেখায় না। পাঠ্যবইগুলোতে আদিবাসীদের সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা দেয় যে, এই মানুষগুলো এখনো সভ্যতার বাইরে, বর্বর ও অরণ্যচারী। যেমন, সাঁওতালদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'লাল পিঁপড়া ও গুইসাপ তাদের প্রিয় খাদ্য' ইত্যাদি। এই মানুষদের সংস্কৃতির কথা, তাদের ভাষার কথা, তাদের সুন্দর জীবনাচারের কথা বলা ও শেখানো হয় না বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিশুদের। দেশের বহু বরেণ্য ত্যাগী সন্তানের কথা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়, কিন্তু আদিবাসীদের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী

www.pathagar.com

যেমন সিধু-কানু প্রমুখের কথা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় না। গবেষকদের ধন্যবাদ যে, তারা আদিবাসীদের বিষয়টি শিক্ষার ক্ষেত্রে সামনে নিয়ে এসেছেন।

মমতাজ লতিফ, শিক্ষিকা, কলাম লেখক

ইংরেজি শেখানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কোন শ্রেণি থেকে এটি শিশুদের শেখানো উচিত হবে। শেখাতে যে হবে, এতে কারো দ্বিমত দেখছি না। গবেষকদের সুপারিশেও ৩য় শ্রেণি থেকে এটি শুরু করার কথা বলা হচ্ছে। গত ৩০ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই স্তরে ২০% শিশু মাত্র কোনোরকমে পাস করতে পারে। বিদেশি একটি ভাষা শিখতে ২-৩ বছরের বেশি লাগার কথা নয়, কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ১২ বছর ধরে ইংরেজি পড়েও ভাষাটা রপ্ত করতে পারছে না। প্রথমত, ভাষা শেখানোর পদ্ধতিতে ত্রুটি, দ্বিতীয়ত, মাতৃভাষায় পরিপক্বতা না-আসা। তাই আমার কথা হলো মাতৃভাষা ভালো করে শেখানোর পরই ইংরেজি শেখা উচিত হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে যে বৈষম্য রয়েছে তার কিছুটা দূর হতে পারে অন্তত থানা পর্যায়ে একটি করে আদর্শ স্কুল খুলে, যেখানে ভালোভাবে গণিত, বিজ্ঞান (ল্যাবরেটরিসহ) ও ইংরেজি শেখা যাবে। স্কুল পরিচালনা কমিটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হলে, পরিচালনা কমিটিতে স্থানীয় কোনো রাজনৈতিক নেতা, কর্মী বা এমপি কমিটিতে থাকতে পারবে না।

অধ্যাপক এইচ. কে. এস. আরেফিন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাথমিক স্তরে নানা ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু আছে, এর বিলোপ সাধন করে একটিমাত্র ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। অবশ্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য রয়েছে, তা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি সর্বজনীন, একক পদ্ধতির সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত।

এ. এন. রাশেদা, অধ্যাপিকা নটর ডেম কলেজ ও সম্পাদিকা, শিক্ষাবার্তা

বৈষম্যমূলক সমাজে একটি বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা কেমন করে অর্জিত হতে পারে, তা ভেবে দেখার বিষয়। শিক্ষার্থীরা কেন ফেল করে এটি জানতে পারলে কেমন শিক্ষা চাই তা প্রণয়নে সুবিধা হয়।

আফরোজা রুবী, শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, ইডেন কলেজ, ঢাকা

আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক স্টাডির প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত কারিক্যুলাম ও পাঠ্যসূচির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, যা বেশ প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক

www.pathagar.com

অনুপাত, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে অলোচনা করা দরকার। এছাড়া তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বহাল থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

শামসুজ্জামান খান, লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও জাতীয় জাদুঘর

তিনি জোর দেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মানবিক, সেক্যুলার করতে হবে এবং জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে শিশুস্তর থেকেই।

ড. অজয় রায়, মুখ্য গবেষক

তিনি উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, কোনো-কোনোটির ওপর বিশদ ব্যাখ্যা দেন। বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এজন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে সেক্যুলার সর্বজনীন ও একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অর্থবহ সংলাপ শুরু করতে হবে, যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ধারণাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ধারণাপত্রটিতে যেসব বিষয় আলেচিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তী প্রতিবেদনে উত্থাপিত হবে বলে আশ্বাস দেন।

ড. আনিসুজ্জামান, সভাপ্রধান ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপ্রধানের বক্তব্যে ড. আনিসুজ্জামান প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন, আমরা সকলের জন্য একই পদ্ধতির সর্বজনীন শিক্ষা চাই এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করা। এই একমুখী বা একই পদ্ধতির শিক্ষা হলো সমাজের ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু সকলে একই শিক্ষা কারিক্যুলাম অনুযায়ী শিক্ষালাভ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের সাথে মাদ্রাসার শিক্ষাকে একই মান ধরায় শিক্ষার বেশ ক্ষতি হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত হলো কেউ যদি মাদ্রাসায় পড়তে চায় পড়ুক, কিন্তু সরকারি অনুদানে কোনো মাদ্রাসা চালানো যাবে না বা সরকারি অর্থে কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ৮ বছর কাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে, যারা আর সাধারণ শিক্ষা নিতে চাইবে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে হবে। ধর্মশিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সব ধর্মের সারকথা নিয়ে নীতিশিক্ষার বিষয় তৈরি করা বোধহয় ঠিক হবে না। বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটিকে জাতির সামনে তুলে ধরা যেতে পারে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা রূপে।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

২ মে ২০০৬, আইইডি সম্মেলন কক্ষ

সভাপ্রধান : ড. অজয় রায়

এই মতবিনিময় সভায় গবেষকগণ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হন। সভায় ছাত্রলীগ (জাসদ সমর্থিত), ছাত্রধারা, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র কেন্দ্র, গ্রিন ভয়েস প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও কিছু সাধারণ শিক্ষার্থী উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। এখানে তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ উত্থাপিত হলো।

- সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সব ধরনের সুযোগ সুবিধার অধিকার পায় তা শিক্ষাব্যবস্থায় নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ও গ্রাম-শহরে বিদ্যমান বৈষম্যসহ সকল ধরনের ভেদ ও তারতম্য না-থাকা— একেই বলা যেতে পারে বৈষম্যহীন শিক্ষা। অনেকে বলেছেন— শিক্ষানীতি হলো শিক্ষা সম্পর্কে 'পূর্ণাঙ্গ পলিসি', যেখানে প্রত্যেকের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ নির্দেশনা দেওয়া থাকে। আমাদের দেশে চলতি যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে তা নেই। প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেন দেশজ সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিষয়বস্তু এমনভাবে উত্থাপন করা হয়, যা শ্রেণি বিভাজনকে, মানুষে-মানুষে ভেদকে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রকট করে তুলে। যেমন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ঢালাওভাবে লেখা হয়— তারা সাপ-ব্যাঙ-কেঁচো ইত্যাদি খায়। এ ধরনের তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে।
- নারী, পিছিয়ে পড়া মানুষ, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগণ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেবার সুযোগ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় থাকতে হবে।
- শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্বের পাঠ্যসূচির আয়তন যেন এত বিপুল না-হয় যে শিশুদের কাছে তা অতি ভার বলে মনে হয়, সেভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। ছোটবেলা থেকে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও বয়ঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষাদান পাঠের বিষয়ে রাখা প্রয়োজন।
- অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। এই স্তরের শিক্ষার যেসব সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানের পথ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় থাকা উচিত। ৫-৬ বছরের সকল শিশুকে শিক্ষায় আনতে হবে— ভর্তিক্ষম

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা কম থাকা এবং মধ্যপথে ঝরে পড়া একটি বড় সমস্যা। দারিদ্র্য ও সামাজিক কিছু বিষয় এর পেছনে কার্যকর।

- স্কুলে নীতিশিক্ষা নামে কোনো স্বতন্ত্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।
- কেউ কেউ প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি চালু ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজির ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মতপ্রকাশ করেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, 'স্কুলের শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করা'। এটি পিতামাতার সাহচর্যে গৃহে ও শিশুযত্ন কেন্দ্রগুলোতে আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটকে মনে রেখে সমাধান করা যেতে পারে। এই স্তরের শিক্ষা কোনো প্রথাগত শিক্ষা নয়, তাই কোনো বই-পুস্তক থাকা চলবে না। কারণ এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে ও আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিখবে। প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে নামেই চালু হোক না কেন, দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমাজের আলোকে এদের কার্যক্রম চালিত হওয়া উচিত, অবশ্যই বিদেশি মডেলে নয়।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের আরও মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষকরা ক্রমেই ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছেন। ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের চাইতে কোচিং সেন্টারের সাথে বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।
- গবেষণানির্ভর প্রতিবেদনটির পদ্ধতিগত উপস্থাপনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক। সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে যে কথা ও নির্দেশ রয়েছে তা বাস্তবায়ন হয়নি, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার নামে সরকার যতগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার অধিকাংশই শিক্ষার উন্নয়নে কাজে আসেনি।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ অবশ্য প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেন শিক্ষার্থী বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সেটিই হওয়া উচিত শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষায়তনগুলোতে এ ধরনের সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতেই হবে— শিক্ষকের মানে, ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও শিক্ষার উপকরণে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্কুলগুলোতে ই-লার্নিং প্রথা চালু ও কম্পিউটার প্রয়োগের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ প্রথা ত্রুটিপূর্ণ— এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে। নিয়োগের সময় অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গুরুত্ব দিতে হবে ক্লাস নেওয়ার দক্ষতার ওপর।
- শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে কাজের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা দরকার, শিক্ষার্থীদেরও যেন এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা থাকে তা নিশ্চিত করতে

www.pathagar.com

হবে। একটি যুৎসই শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র সমস্যার ওপর নজর দিতে পারেন।

- অনেকে বলেছেন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বাণিজ্যিক শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেমন, 'small business management' কোর্স। কারো কারো মতে, মাধ্যমিকে ১০০ নম্বরের অর্থনীতি ও মৌলিক ব্যবসায় নীতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি বিষয় বিজ্ঞান শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পাবলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও স্টেকহোল্ডারদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা দরকার বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেন।*

* এই আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভার বাইরেও মুখ্য গবেষক ড. অজয় রায় নানা সময়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সাথে মতবিনিময় করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা নিয়ে জ্ঞানী মানুষদের ভাবনা

যুগে যুগে জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভেবেছেন, সেরকম কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির শিক্ষাভাবনার সারকথা এখানে তুলে ধরা হলো।

আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন, 'মানুষকে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান করাই যথেষ্ট নয়। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলে সেই মানুষ এক ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে সুসংগতভাবে বিকশিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। ...একজন তরুণের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাছবিছার করে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে তোলাও একটি উত্তম শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ...শিক্ষাদানের পন্থা এমন হওয়া উচিত, যাতে যা শেখানো হচ্ছে, সেটিকে তরুণরা কঠোর কাজ হিসেবে নয়, মূল্যবান উপহার হিসেবে গণ্য করতে পারে।'

শুধুমাত্র স্কুলে লভ্য শিক্ষা থেকে পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়, একথা আইনস্টাইন নানা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'একজন মানুষকে পরবর্তী জীবনে যেসব জ্ঞান সরাসরি ব্যবহার করতে হয়, স্কুলে সে বিষয়গুলো শেখাতে হবে। অথচ জীবনের চাহিদা এত বহুমুখী যে, স্কুলে সেসব বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষকে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়। সবসময় স্কুলের এই লক্ষ্য থাকা উচিত যে, একজন তরুণ যেন স্কুল জীবন শেষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, একজন সুসংগত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। বিশেষ জ্ঞান অর্জন নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নিজের বিচার ক্ষমতা বিকশিত করাকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

এ. এন হোয়াইটহেড

গণিতজ্ঞ দার্শনিক এ. এন হোয়াইটহেড সংস্কৃতি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলেন, 'A merely well informed man is the most useless born in God's earth. What we should aim at producing is men who possess both culture and expert knowledge in some special direction.' তিনি শিক্ষাকে একটি পবিত্র ধর্মীয় (religious) বিষয় বলে বিবেচনা করেন। তিনি বলেছেন, 'The essence of education is that it be religious. Pray, what is religious education? A religious education is on education which

www.pathagar.com

indicates duty and reverence. Duty arises from our potential control over the course of events. Where attainath knowledge could have changed the issue, ignorance has the guilt of vice'[**]

বার্ট্রান্ড রাসেল

শিক্ষা নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল নানা কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতার সংকোচন করার পক্ষে তিনি। অর্থাৎ শিশু চাইলেই তাকে যা কিছু করতে দেওয়া যায় না। তিনি শিশুর যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়দানের প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'শিশুটি যদি পিন গিলে ফেলতে চায়, তাহলে?' সুতরাং তাঁর মতে, '...শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা যাঁরা বলেন, তারা এর মাধ্যমে এ কথাটি বলতে পারেন না যে, শিশুদের সারাদিন ইচ্ছে মতো চলতে দেওয়া উচিত। কিছুটা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো— কতটুকু শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং কীভাবে তা কার্যকর করা যায়।'

শিক্ষাব্যবস্থার দুটি মুখ্য উপাদান হলো ক. ছাত্র সম্প্রদায় এবং খ. শিক্ষকমণ্ডলী। রাসেল স্কুলে শিক্ষকের ভূমিকার ওপর সবচাইতে গুরুত্ব দিতে বলেন, 'আধুনিক বিশ্বে স্কুল শিক্ষককে কদাচিৎ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়োগ করে এবং যদি দেখা যায় যে, তিনি প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছেন না, তাহলে তাঁকে 'চাকরিচ্যুত' করা হয়। শিক্ষার সাথে যতগুলো পক্ষ জড়িত, তাদের মধ্যে শিক্ষক হচ্ছেন সর্বোত্তম। প্রগতির জন্যে মূলত তাঁর সাহায্য আমরা নিতে পারি।' শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য হলো, '...বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী হয়। শ্রমজীবী বাবা-মা চান তাদের সন্তান দ্রুত শিক্ষা শেষ করুক, যাতে তার আয় থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। ...(অন্যদিকে) উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে পেশাজীবীরা বেশি আয় করে থাকেন, তাই তাঁরা চান তাঁদের সন্তানরাও যেন এ সুবিধাটি পায়। আমাদের বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজে গড়পরতা বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য উত্তম শিক্ষা চান না। তাঁরা এমন শিক্ষা চান, যেটি অন্য লোকদের প্রাপ্ত শিক্ষার চেয়ে ভালো। শিক্ষার সাধারণ মান নিচু রেখেই এটা করা সম্ভব। আর এ কারণেই আমরা আশা করতে পারি না যে, শ্রমজীবী সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে একজন পেশাজীবী আগ্রহী হবেন। একজন পেশাজীবী আপন সন্তানদের জন্য যেসব সুব্যবস্থা বজায় রাখতে চান, যদি সাধারণের জন্য তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব তীব্র না হয়, তাহলে তিনি

[**] *Aims of Education*, A. N. Whitehead.

www.pathagar.com

সেসব সুব্যবস্থা ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সন্তানরাও পাক তা চাইবেন না।' এক কথায়, উচ্চকোটির মানুষেরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছ থেকে, তা নিম্নকোটি ব্রাত্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তা রাষ্ট্র ও সমাজের অধিকারীরা কোনমতেই চাইবেন না। আর এ কারণে, অন্যসব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনাকাঙ্ক্ষিত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য পশ্চিমি সমাজ কাঠামোকে লক্ষ্য করে ও দীর্ঘকাল আগে বলা হলেও আমাদের সমাজের জন্যও এখনো এর প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমাদের রাষ্ট্রচালকেরা ও সুবিধাভোগী সামাজিক পরজীবীরা চান না শিক্ষার সুযোগসুবিধা ইতরজনের কাছে পৌঁছাক। এজন্যই মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের নামে শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে বাণিজ্যিক পণ্যের দৃষ্টিতে এবং শিক্ষাকে দ্রুত বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে সচেতনভাবেই।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদ বিবেকানন্দের মতে, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে তারই প্রকাশ সাধনাকে বলে শিক্ষা। আমাদের কর্তব্য পথ থেকে ওই বাধাগুলোকে সরিয়ে দেওয়া। শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হতে হবে শিক্ষককে— প্রত্যেক শিশুই অনন্ত (ঈশ্বরীয়) শক্তির অধিকারী, সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষার অন্য দিকগুলো হলো—

- ...বিভিন্ন চিন্তাশক্তিকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে জীবন ও চরিত্র গড়ে ওঠে, মানুষ তৈরি হয়।
- শিক্ষা হবে ইতিবাচক— পজিটিভ আইডিয়াগুলো সঞ্চারিত করতে হবে।
- দুর্বলতা সৃজন প্রকৃত শিক্ষা নয়।
- আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা প্রদান।
- জনগণের কল্যাণে শিক্ষা, আর দরিদ্রের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর কালের প্রাতিষ্ঠানিক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সবসময় সোচ্চার ছিল। বিদ্যালয়গুলো তাঁর দৃষ্টিতে 'অচলায়তন', এদেরকে তিনি অভিহিত করেছেন 'শিক্ষার কারখানা' নামে। স্কুল সম্পর্কে এ ধরনের নেগেটিভ রবীন্দ্রচিন্তার পশ্চাতে

www.pathagar.com

কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের ধারণায় স্কুলগুলো হলো সমাজবিচ্ছিন্ন। তাঁর ধারণায়, '...বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।'

পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণাকে সম্পৃক্ত করে চাইতেন এক ধরনের শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলতে, যা হবে বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন— 'অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।"

প্রকৃতি হলো রবীন্দ্র মানসের এক বড়সড় রাজ্য। তিনি মনে করতেন, যে বিদ্যালয়ের কথা তিনি ভাবেন তা অবশ্যই গড়ে উঠবে প্রকৃতির কোলে শহর থেকে দূরে কোথাও; তাঁর মতে, 'আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।' রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের নামই হলো 'শান্তিনিকেতন'। প্রকৃত ও সুশিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন, '...তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।' অন্যত্র আরও বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।' আমার দৃষ্টিতে রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনার মূল সুরটি হলো বিদ্যায়তনের দেওয়ালে আবদ্ধ শিক্ষা দান আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল হতে পারে না, কেননা জীবনের মূলে রয়েছে— 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'।

মহাত্মা গান্ধী

অহিংস-অন্দোলনের নেতা গান্ধীজীও জীবনসম্পৃক্ত শিক্ষার কথা আন্তরিকভাবে ভেবেছিলেন। তিনি অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার বিশেষত্ব ছিল— এ শিক্ষা হবে সাত বছরব্যাপী, মান হবে তখনকার প্রবেশিকা শ্রেণির অনুরূপ, তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও পাঠ্যসূচি ভিন্নতর। এর মৌলিকত্ব হচ্ছে এই শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক— অর্থাৎ একটি শিল্পকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। শিক্ষার বাহন হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। গান্ধীজীর নির্দেশে জাকির হোসেন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লিতে এ ধরনের একটি বুনিয়াদি শিক্ষায়তন স্থাপন করেছিলেন, যার আধুনিকতম রূপ হচ্ছে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাকির হোসেন দেখেছেন এভাবে, 'the scheme envisages the

www.pathagar.com

idea of cooperative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children.'। মহাত্মার পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অবশ্যই হতে হবে স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর (self supporting)।

সৈয়দ আবুল হোসেন

মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিক্ষা সম্পর্কে বলতেন, 'গোড়াতেই বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথা বলতে চাই, যে শিক্ষায় আমরা চাকুরী ভিন্ন আর কিছু চোখে দেখতে বা করতে শিখি না— সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। ...কথা হচ্ছে, শিক্ষা কি শুধু চাকুরীর জন্যই করতে হবে? আমার মনে হয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে— মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবনযাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম করে তোলা। ...এখন প্রশ্ন এই দেশের মানুষকে কেমন করে মুক্তি দেওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তরটি সোজা কথায় এই যে, স্কুল-কলেজগুলো প্রকৃত শিক্ষা কেন্দ্র করে গড়ে তোলা ও শিক্ষকগণকে প্রকৃত মুক্তির পুরোহিত করে তোলা। আধুনিক জগতের বড় বড় জাতির উত্থানের মূলে শিক্ষকদের অজস্র ত্যাগ ও অক্ষয় দান মূর্ত হয়ে আছে।

...প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। জাতির সূতিকাগার হচ্ছে ঐগুলো, সেখানেই জাতির ভবিষ্যৎ— সেখানেই মুক্তির বাহন সৃষ্টি হয়; ভবিষ্যৎ মানুষের ভিত্তি পত্তন হয় সেইখানে। ...অভিশাপ হচ্ছে— অতীতের অন্ধ মোহ। ...কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েই তাদের অতীতের ইতিহাসের পানে তাকিয়ে বর্তমানের অক্ষমতা ও দৈন্যের লজ্জাকে ঢেকে রাখছে। হিন্দু মনে করছে, প্রাচীন হিন্দু আধুনিক জগতের কিছুই হাসিল করতে বাকী রাখে নি। আবার মুসলমান মনে করছে— প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার চরমে পৌঁছেছিল। তাই হিন্দু চাচ্ছে প্রাচীন হিন্দুত্বকে পুনর্জীবিত করতে, মুসলমান চাচ্ছে প্রাচীন ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। ...(আর একটি) অভিশাপ হচ্ছে— আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার-ধারণা ও তজ্জাত ধাত। হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই ধারণা ও সংস্কার পৃথক। হিন্দুর ধারণা হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র হতে এবং মুসলমানের ধারণা মুসলিমের ইতিহাসও ধর্মশাস্ত্র হতে জন্মলাভ করেছে। উভয়ই আবার জন্মলাভ করে যুগের প্রয়োজন অনুসারে।"*

* চল্লিশের দশকে কথাগুলো বলা হলেও মনে হচ্ছে তিনি যেন বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই কথাগুলো বলছেন।

www.pathagar.com

কাজী মোতাহার হোসেন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, আমরা গত ত্রিশ দশকে কতটা সংস্কৃতবান, শিক্ষিত, সভ্য এবং অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি সে কথা আমি বলতে পারব না, সে বিষয়ে বলতে পারেন আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থবিষয়ক মন্ত্রণালয়। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান বিদ্যার জনক কাজী মোতাহার হোসেন বলতেন, 'কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য।' আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে দৈন্যদশা পরিস্ফুট তা থেকে আঁচ করা দুঃসাধ্য নয় কাজী মোতাহার হোসেনের মাপকাঠিতে আমরা কতটা সভ্য হয়েছি। মোতাহার হোসেন আরও বলেছেন, '...(জাতির) ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর... এদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।' কাজী সাহেব আরও বলতেন, 'মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এরও আগে পিতামাতার মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক... ইত্যাদির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।" কাজী সাহেব মনে করতেন, যে শিক্ষা বর্তমানে চালু আছে তা নিজদেশে আমাদের পরবাসী করে তোলে, '...আমরা বিদেশীর সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, কিন্তু তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজী নই। যে শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখায় বা তাদেরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি জোগায়, সে দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দূরে থাকা দরকার।'

বিজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদ বহুকাল আগে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সেই দুষ্ট শিক্ষাই আজ দুষ্টক্ষতের মতো দুষ্ট মানুষের মাধ্যমে সমাজের কাঁধে চেপে বসেছে।

সুভাষচন্দ্র বসু

শিক্ষা সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি— ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ— অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগের দেশসেবার কার্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলো গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলো পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে— হয়তো বড় চাকুরী পাইতে পারে— কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি— একথা সত্য কিন্তু সেসব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম

www.pathagar.com

করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা— শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নূতন পথে নূতনভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা।*

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী মানুষ হয়ে ওঠে তাই প্রকৃত শিক্ষা। তিনি মনে করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। "দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। ...যে শিক্ষায় মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে— তা তারা আমাদের দেয় নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। ...পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা— যাতে নিজেদের সর্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে।

পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে 'standard of living' বড় করা। ...ওদের সমাজনীতির যে 'interpretation'-ই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। ...এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমন ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য।" তিনি অন্যত্র পুনরায় বলেছেন, '...এ দেশের রাজার মাথার কোহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্যন্ত, যেখানে যা কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। ...এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে।

ইয়োরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,— এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালোই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না— কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভালো।' তিনি আরও বলেছেন, '...বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রণালী এ-দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই

---

* সিলেটে ছাত্র সম্মেলনে বাংলা ১৩৩৬ সালে প্রেরিত 'ভ্রান্ত আদর্শ' শিরোনামে ভাষণ।

www.pathagar.com

বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।'*

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আধুনিক কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের জনক সত্যেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা নিয়ে প্রচুর লেখা লিখেছেন, বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। সারাজীবন তিনি মাতৃভাষা বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা ও শিক্ষাদানের কথা বলে এসেছেন। শিশুদের শিক্ষা নিয়েও তিনি অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছেন। শিশুদের পড়ানো নিয়ে প্রায় ষাট বছর আগে লিখেছিলেন, 'জ্ঞান উন্মেষের পর শিশু যখন তার চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে তখন মন তার চরম বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চারপাশে যা কিছু সে দেখে, সবই তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়, তার কৌতূহলী মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এজন্যে শিশুদের শিক্ষার ভার যাদের হাতে আছে, তাদের উচিত সাধারণত হাতের কাছে যেসব জিনিস পাওয়া যায়, যা ছোট ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে— যেকোন ফুল, লতাপাতা, পাখি এমনি সব টুকরো-জিনিসের ওপর নজর দিতে শেখানো। কাজ অবশ্য শক্ত। শিক্ষকদের নিজেদের মনকে ছোটদের কৌতূহলী মনের রসে রসিয়ে নিতে হবে। তার জন্য চাই শিক্ষকদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন।'

'প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় রাখতে গেলে শিশুর মনে সবার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে কৌতূহল তাদের নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহের ভার দিতে হবে। ...আমি দেখি বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এমন সব বড় বড় কথা বলা হয়, যা শুনলে আমাদেরই প্রাণে আতঙ্ক আসে।...

আসল কথা, বিজ্ঞান কেন আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়? বাস্তব সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা খাঁটি হবে বলে। ...বিজ্ঞান আমাদের এটুকু শিখতে সাহায্য করে, প্রকৃতির মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞান সে সত্যকেই উদ্ঘাটিত করে দেয়। আমাদের মনের বাইরে কোন কিছু ঘটে গেলেই সেটা কোন দেবদানবের কীর্তি হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ...অসুখ করলেই যদি আমরা মনে করি যে, এ নিতান্ত দৈবের ঘটনা, দেবতার সন্তুষ্টি সাধন ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই এতে, তবে আমাদের টিকে থাকা শক্ত হবে।'

---

* কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১৩২৮ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষার বিরোধ' নামে ভাষণ দিয়েছেলেন। সে সময় ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই ভাষণটি প্রদত্ত হয়।

www.pathagar.com

ছাত্রদের অমনোযোগিতা ও ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য দায়ী করেছেন মুখ্যত শিক্ষকদের, 'দায়ী আমরা শিক্ষকরা, আমরা তাদের সামনে বস্তুর পাহাড় তুলে ধরেছি আর চেয়েছি সেই পাহাড়ই তারা উদ্গীরণ করুক। বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারি নি। ...ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও কলকারখানার মত। পদে পদেই তাই ছাত্ররা আজ বিদ্রোহ করে।

তবু সব সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য... শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে। ...আর তা প্রথমেই অর্জন করতে হবে শিক্ষকদের। ...জানি, বড় বড় কাজ করার সুযোগ পান না আমাদের শিক্ষকরা। কিন্তু ছোট ব্যাপারেও আমাদের কিছু করবার আছে।'[২৮]

মেঘনাদ সাহা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মেঘনাদ সাহার মতে, 'শিক্ষা বিষয়টিকে একটু বিশেষ করে তলিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষা না পেলে মানুষের কার্যকরী শক্তি জেগে উঠতে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগবার উপযুক্ত হয় না। ...শিক্ষার আদর্শের আর একটি দিক আছে— মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং দেশের সর্বপ্রকার কর্মকেন্দ্রিকে পরিচালিত করার মত শক্তি সংগ্রহ করা। যে শিক্ষাতে আমাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না ঘটে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শুধু অতীতের জ্ঞানে কুলাবে না, অতীতে যাহা জ্ঞান বলে গণ্য হত এখন তাহা অসম্পূর্ণ। ...বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। ...বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে।'[২৯]

কাজী আবদুল ওদুদ

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, 'বর্তমান জগতে মানুষের জীবন বড় জটিল ও অস্বস্তিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ...আমাদের দেশের আধুনিক চিত্ত যে কত বিশৃংখলা-পূর্ণ তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে দেশের শিক্ষার অবস্থা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে।...

যে ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয় তার সাহায্যে শিক্ষালাভ করলে তাতে অনেক ত্রুটি যে অনিবার্য হয়ে পড়ে এ-বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলেরা বোধহয় একমত। কিন্তু শিক্ষার বাহনের সুমীমাংসা হলেও শিক্ষার অবস্থা যে আশানুরূপ সুন্দর হবার পথে দাঁড়াবে সে-আশায় আশান্বিত হওয়া শক্ত এই একটি কারণে যে, শিক্ষাদান বা গ্রহণ করবে যে মন তার অবস্থা যদি কিছু অস্বাভাবিক

www.pathagar.com

থাকে তবে শুধু শিক্ষাদানের ভাষার পরিবর্তনে বাঞ্ছিত ফললাভ না হওয়াই সম্ভবপর। এই সুব্যবস্থিত মনের অভাব নানা কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে...। কিন্তু সমস্যা যদি এই হতো তবে ব্যাপার মোটেই কঠিন হতো না, কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা প্রবেশার্থী তাদের ত্রুটি নগণ্য। তাই মনের গণ্ডগোল আমাদের দেশে এর চাইতেও জটিল— এ ব্যাধিতে হয়ত বেশী করে ভুগছেন শিক্ষার্থীদের গুরুস্থানীয়েরাই।

এই ব্যাধি দেশের গুরুস্থানীয়দের আক্রমণ করেছে এইসব দিক থেকে : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন-যাপন প্রণালীর সংঘর্ষ; একালের প্রাচ্য জীবনে যে সব চিন্তাধারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে— দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সে-সবের কি যোগ সে-সব অনুধাবনে অনিচ্ছা; দারিদ্র্য।

...কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব ও দারিদ্র্য আমাদের জীবনে যে-বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে একালে আমাদের দেশে যেসব চিন্তাশীলের জন্ম হয়েছে তাঁদের প্রভাব। প্রতিভাবান শক্তিমান নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর সাহচর্য বা অনুবর্তিতা করতে হয় সজাগভাবে, কেননা শক্তিমান বলেই ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বিবর্জিত তিনি নন, আর সে-বিশেষত্ব যুগধর্মের প্রভাবে গঠিত; তাই একযুগের মহাপুরুষের অনুবর্তিতা অন্যযুগের লোকদের করতে হয় যথেষ্ট সচেতন হয়ে...। ...হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও বাংলাদেশে শিক্ষার এক বিশেষ অন্তরায়। ...কিন্তু এর এক ফল ফলেছে যে পাঠ্যপুস্তকে সব শ্রেণীর লোকের প্রিয় ব্যক্তিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কথাগুলো হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি অর্থহীন; শিক্ষকরাও ভাসা-ভাসা ধরনে সবাইকে ভার বলে কর্তব্য শেষ করছেন। সার্থক জীবন-যাত্রার জন্য বিচারপরায়ণতা আমাদের চাই-ই তা' যত ভুল-ত্রুটির ভিতর দিয়েই সে বিচার চলুক— সেই বড় প্রয়োজন শিক্ষকরা এমনি গণ্ডগোলে সমাধা করতে পারছেন না, বা করছেন না।

...শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নিশ্চয়ই, কিন্তু সদুপায়ে অর্থোপার্জনও ঘৃণার সামগ্রী নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের ভিতরকার সুপ্ত সৃষ্টি-শক্তিকে সচেতন করা তবে যে-শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনীয় জীবিকা আহরণের জন্য সাহায্য করে না সে-শিক্ষা কেন আদৌ শিক্ষা নামে খ্যাত হবে, এ প্রশ্ন জনসাধারণের মনে জাগলে শিক্ষকদের হুঁশিয়ার হয়ে উঠতে হবে অনেকখানি। কিন্তু দায়িত্বও মানুষ গ্রহণ করতে পারে ইচ্ছুক হয়ে বা অনিচ্ছুক হয়ে। দেশের জনসাধারণ যখন দেশের শিক্ষিতদের প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য যাচাই করতে চাইবেন তখন সে-পরীক্ষা যদি তাঁরা শ্রদ্ধার ভাবে গ্রহণ করতে পারেন তবে সেটাই হবে দেশের জন্য কল্যাণকর। ...সমাজ বা দেশের বিচিত্র জীবন-যাত্রাও তেমনি শিক্ষকদের বুকে স্পন্দন জাগাতে পারে, কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি শিক্ষক— মানুষের মনের লালন,

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা-বিধান, তাঁর বড় কাজ, এবং সেই জন্য তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বা বিশেষ-ধর্ম-প্রেমিক ইত্যাদি যাই হোন তারও উপরে তিনি বৈজ্ঞানিক, বিচারবুদ্ধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন— একথা বিস্মৃত হলে মানুষের সেবাও আর তাঁর দ্বারা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজ আজ মনোজীবী নন, বড়-জোর ভাবপ্রবণ— মনে হয়, শিক্ষা-ব্যাপারে এ এক বিষম সঙ্কট।'*[৩০]

*এছাড়া আমাদের কালের আমাদের দেশের বিশিষ্ট কতিপয় শিক্ষাবিদের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে লেখার একটি তালিকা প্রাসঙ্গিকীতে উল্লেখ করা হলো।

* বাংলা ১৩৩৮ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠবার্ষিক অধিবেশনে 'শিক্ষার সঙ্কট' নামে পঠিত প্রবন্ধ।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১১

'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' : উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম

সারণি ১৬.১ : 'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' : উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার পঠনীয় বিষয়বস্তু

'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' শাখা	মোট নম্বর	মন্তব্য
১. বাংলা	২০০	
২. ইংরেজি	১০০	অনেকে ইংরেজিকে ২০০ করার পক্ষে মত দিয়েছেন
৩. মানবতা ও সম-অধিকার : আমাদের লোকঐতিহ্য[১]	৫০	
মোট	৩৫০	
অর্থ ও নীতি বিষয় (৩টি), আবশ্যিক	৬০০	
১ নম্বর বিষয়	২০০	
২ নম্বর বিষয়	২০০	
৩ নম্বর বিষয়	২০০	
ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)[২]	২০০	
প্রযুক্তি বা বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি)[৩]	১০০	
মোট	১২৫০	

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১২

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

অজয় রায় ও শহিদুল ইসলাম

১. পশ্চিমের জানালা দিয়ে এল আলো : শৃঙ্খলের সাথে জ্ঞানের শৃঙ্খলা

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এদেশে ইংরেজ শাসনের পথ বেয়েই এসেছে, শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। কী ধরনের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পাশ্চাত্যে মুক্তচিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল তা আমাদের অল্পবিস্তর জানা। যেসব উপাদান এই বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল, তার কোনোটিরই অস্তিত্ব দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই প্রাচ্যের কোনো দেশেই উপস্থিত ছিল না, ছিল না অনুকূল উদার সেক্যুলার পরিবেশ। যে সময়ে নিউটন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন এদেশে চলছিল আওরঙ্গজেবের শাসনকাল (১৬৪২-১৭২৭)— যে কাল রক্ষণশীলতার কাল, পশ্চাৎমুখিতার কাল, ধর্মান্ধতার কাল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে চর্বিতচর্বনের কাল নামে ইতিহাসে পরিচিত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন কালে সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়ে; ক্ষয়িষ্ণু আধাসামন্ততন্ত্র নির্জীব হয়ে পড়ে, আর নতুন সমাজব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নি। এই পরিমণ্ডল ও আবহে জ্ঞানের নতুন বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় হয় না, কেননা সমাজের কোনো চাহিদা ছিল না।

এসব কারণেই আধুনিক চিন্তা ও বিজ্ঞানও প্রবেশ করেছে পশ্চিমী বিশ্ব থেকে, আর তা ঘটেছে ইংরেজ কর্তৃক আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে। জগদীশ চন্দ্র জগদীশ চন্দ্র হয়ে উঠতেন না যদি না তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সংস্পর্শে আসতেন। এছাড়া ছিলেন সহানুভূতিশীল কতিপয় ব্যক্তি ও ইংরেজ প্রশাসকের সযত্ন প্রয়াস। এ ধরনেরই একজন ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন উইলিয়ম জোন্স (Willium Jones), এশীয় বিশেষ করে ভারতীয় বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে লন্ডন রয়্যাল সোসাইটি (London Royal Society)'র মডেলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (Asiatic Society of Bengal), ১৭৮৪ সালে। জোন্স স্বয়ং ছিলেন পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল 'To Study Man and Nature of Asia', অর্থাৎ এশিয়ার জনগণের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব , শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রাচীন সাহিত্য এবং মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণা। সীমিত সুযোগ নিয়েও সোসাইটি প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকেই গবেষণা ও স্বচ্ছ চিন্তার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের নানা শাখায় এর কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চাতেও সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে এদেশের 'উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল পরিচিতি (Flora and Fauna) নিয়ে সোসাইটি তাৎপর্যময়

www.pathagar.com

অবদান রাখে। সোসাইটির আন্তরিক চেষ্টায় ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞানচর্চার নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে— এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : 'Indian Museum, Trignometrical Survey of India, Geological Survey of India, Indian Meteorological Department, Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, Indian Science Congress, Indian National Institute of Science, Archeological Survey of India...' ইত্যাদি।

প্রায় চার দশক ধরে বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার ফল প্রকাশের বাহক হিসেবে সোসাইটির জার্নাল একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গভাষীদের মধ্যে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত তাঁর অ্যানাটমিক্যাল প্রবন্ধাদি এবং ভূপৃষ্ঠ সমীক্ষাবিদ ও ফলিত গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার তাঁর সার্ভেসংক্রান্ত যাবতীয় ফলাফল ও গাণিতিক প্রবন্ধাদি সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বাঙালি পথিকৃৎবৃন্দ, যেমন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পি. এন. ঘোষ, জে.সি. বোস, পি.সি. রায়, মহেন্দ্র লাল সরকার, ইউ. এন. ব্রহ্মচারী এবং আরও পরে কলকাতানিবাসী মাদ্রাজী বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন প্রমুখ বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার ফলাফল বিশ্ববাসীকে এই জার্নালের মাধ্যমেই অবহিত করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজ সরকারের পাশাপশি এদেশে জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে পথ প্রদর্শক হিসেবে মিশনারিরা (পর্তুগিজ, দিনেমার, ইংরেজ প্রমুখ) এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের কেরীসহ আরও দু'জন মিশনারির, যারা শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে খ্যাত, কর্মতৎপরতা স্মরণীয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজ আধুনিক শিক্ষা প্রসারে তাৎপর্যময় অবদান রাখে। মিশনারিদের উদ্যোগে তৎকালে সারা বাংলাদেশে ১৮০৪-১৯১০-এর মধ্যে ১০৯টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বাংলা গদ্য রচনায় শ্রীরামপুর কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকার কথা আমাদের সবারই জানা। একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ও তার মধ্য দিয়ে সেক্যুলার চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তন ও কলেজগুলোর ভূমিকার কথা। এর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি হলো হিন্দু কলেজ— মূলত বেসরকারি চেষ্টায়— ডেভিড হেয়ার, রামমোহন, বিদ্যাসাগরসহ এতদ্দেশীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল, '...to instruct the sons of respectable Hindoos in the European and Asian Languages and Sciences.'[৩১] এটি সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোত্তম পাদপীঠে পরিণত হয়, আর এই কলেজের

www.pathagar.com

ছাত্রদের দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে। প্রথমদিকে শুধু হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও, ১৮৫৫ সালে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হলে এর দ্বার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। শুধু প্রেসিডেন্সি নয়, সে সময় প্রতিষ্ঠিত অনেক সরকারি ও বেসরকারি কলেজ আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বিস্তর অবদান রেখেছিল, এদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যথা, রাজশাহী কলেজ, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ (বরিশাল), আনন্দমোহন কলেজ (ময়মনসিংহ), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কারমাইকেল কলেজ (রংপুর), এম. সি. কলেজ (সিলেট), বি.এল কলেজ (খুলনা)... ইত্যাদি। তাছাড়া কলকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ তো ছিলই। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এসব কলেজের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এর ওপর বর্তায়। ১৮৫৭ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত এ ধরনের কলেজের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারণি দ্রষ্টব্য।

সারণি ৯ : *উনবিংশ শতাব্দীর দ্বারে বাংলায় কলেজের সংখ্যা*

প্রদেশ/প্রেসিডেন্সি	বছর	কলেজের সংখ্যা	কারিগরি/ মেডিকেল	৪৫ বছরে বৃদ্ধির হার (%)
বাংলা	১৮৫৭	১৪	১	
	১৯০২	৭১	১	৭৯.২
বম্বে	১৮৫৭	২	১	
	১৯০২	৬	১	৫৭.১
উত্তর প্রদেশ	১৮৫৭	৪	১	
	১৯০২	৩২	১	৮৪.৮
মাদ্রাজ	১৮৫৭	৩	১	
	১৯০২	৫৫	১	৯২.৯

ব্রিটিশশাসিত বাংলায় আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) ভূমিকা মোটামুটি সকলের জানা, তাই এখানে আলোচিত হলো না। ১৮৫৭ সালে যেখানে সারা উপমহাদেশে মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে ১৯২২ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি ১২-তে উন্নীত হয়। এসময় সমগ্র ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজারের মতো, এর মধ্যে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়ত ৬ হাজার।[৩২]

www.pathagar.com

২. মেকলে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা নামের যে স্তরভিত্তিক সিঁড়িভাঙা শিক্ষা অবকাঠামো চালু রয়েছে, ইংরেজ আসার আগে এরকম কোনো শিক্ষাপদ্ধতির অস্তিত্ব এ দেশে ছিল না। ১৮৩৫ সালে টমাস মেকলের সুবিখ্যাত প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই 'আধুনিক পদ্ধতি'র দ্বারোদঘাটন হলেও ১৮৫৪ সালের 'উড'-এর বিখ্যাত প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থাটির ব্যাপক প্রসার ঘটে। আমরা মূল প্রতিবেদনে মেকলের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের গূঢ় কারণের কথা উল্লেখ করেছি। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবুও বলতে হবে যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আমরা আধুনিক শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে উঠি, প্রবেশ করতে শুরু করি পশ্চিমের জ্ঞান রাজ্যে। সেই অর্থে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য রয়েছে।

এই সিঁড়িভাঙা পদ্ধতিটির বয়স মাত্র ১৫০ বছর। শুধু এদেশে নয় সারাবিশ্বে আজ মোটাদাগে এই শিক্ষাপদ্ধতিটিই চালু আছে। তবে ইংরেজ আমলেই এই আধুনিক শিক্ষা কাঠামোটি ব্যাপক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। মেকলেরও আগে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ এসেছিল ১৭৯২ সালে চার্লস গ্রান্টের সুপারিশের মাধ্যমে। সমাজ পরিবর্তন ও ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে মেকলে (১৮৩৫) থেকে সার্জেন্ট কমিশন (১৯৪৪) পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। যেমন উইলিয়াম এডামসের শিক্ষাবিষয়ক জরিপ (১৮৩৬), হান্টার কমিশন (১৮৮২), কার্জন শিক্ষা কমিটি (১৯০২), নাথান কমিটি (১৯১৪), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭), হার্টগ কমিশন (১৯২৯), সাপ্রু কমিশন (১৯৩৪), উড-এ্যাবোট কমিটি (১৯৩৬-৩৭) ইত্যাদি। এই কমিশন বা কমিটিগুলো প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নানারকম সুপারিশ করে। বলাই বাহুল্য, সেসব সুপারিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে করা হয়েছিল, এবং স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের সহায়ক ছিল না।

৩. ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজ শাসক দেশ ছাড়ার কালে যে ব্যবস্থাটি আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলাম তা হলো :

- প্রথম ধাপ বা প্রাইমারি : ১ম-৪র্থ শ্রেণি (বয়স ৬-১০);
- দ্বিতীয় ধাপ বা মধ্য ইংরেজি বা মাইনর (Middle English School) : ৪র্থ-৬ষ্ঠ শ্রেণি (বয়স ১০-১২)। তখন এই স্তরকে বলা হতো 'মাইনর';

www.pathagar.com

- তৃতীয় ধাপ বা উচ্চ ইংরেজি (Higher English School) : ৭ম-১০ম শ্রেণি (বয়স ১৩-১৬)। তখন এই স্তরকে বলা হতো প্রবেশিকা (Matriculation);
- চতুর্থ ধাপ বা মাধ্যমিক বা কলেজীয় স্তর (Intermediate Science or Arts);
- এরপর ছিল :

  ক. কলেজে দু'বছরের ডিগ্রি (সাধারণ বা কোনো বিষয়ে অনার্সসহ)

  খ. বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছরের উচ্চতর ডিগ্রি এমএ/এমএসসি। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক অনার্স কোর্স ছিল ৩ বছরব্যাপী এবং স্নাতকোত্তর এমএ/এমএসসি কোর্স ছিল ১ বছরব্যাপী (উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

তবে বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে (ইংরেজ আমলে যে স্তরটিকে বলা হতো মাধ্যমিক বা অন্তর্বর্তীকালীন— Intermediate) নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতিতে উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষটিকে ম্যাট্রিকুলেশনের সাথে যুক্ত করে স্কুল শিক্ষা একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বছরটিকে স্নাতক শ্রেণির সাথে যুক্ত করে স্নাতক কোর্সকে তিনবছর মেয়াদি করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন টেকে নি— বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থাকে তাঁরা শিক্ষা সংকোচন নীতি বলে অভিহিত করে। এর ফলে ন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, কারিগরি বিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে ওঠে। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় অবশেষে।

৪. প্রাক-ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও বাংলাদেশের শিক্ষানীতি

ঔপনিবেশিক শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করতে গেলে আমরা প্রথমেই পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেব। তার কারণ ঐতিহাসিক। আমরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে এক হাজার মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত ছিল এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে বাংলাদেশের মানুষের কোনো ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক নীতি সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই আসত। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তা ছিল অবশ্যপালনীয়। তাই পাকিস্তানের শিক্ষানীতি (যদি কিছু থেকে থাকে) আমাদের শিক্ষাচিন্তাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। তাই পাকিস্তানের শিক্ষাচিন্তার একটি প্রত্যয় সুনির্দিষ্ট করা মোটেই অযৌক্তিক হবে না।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পর সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এস. এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু ওই ১২ বছর পাকিস্তানে কোনোরকম শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না, একথা সত্যি নয়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা কাঠামোর শরীরে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ ও দর্শনের একটা প্রলেপ লাগানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। সরকার নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করে। সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করত এবং তা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাঁধে চাপিয়ে দিত। সেসব অধ্যাদেশকে সাংবিধানিক আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান শরীফ কমিশন গঠন করেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে সে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ছাত্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান তা প্রত্যাহার করে নেন। এরপর ১৯৬৭ সালে নূর কমিশন গঠন করে শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু আইন প্রণয়নের চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই বলা যায়, পাকিস্তানের ২৪ বছর এদেশের শিক্ষা কোনো সুচিন্তিত শিক্ষানীতির দ্বারা পরিচালিত হয় নি। তবু, আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার ছোট্ট একটি ইতিহাস এখানে তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে। পাঁচদিন সে সম্মেলন চলে। তড়িঘড়ি এই সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্য ছিল— 'to reviewing the existing educational system in Pakistan and evaluating a comprehensive programme for its re-orientation in conformity with the ideals and aspirations of the new born state.'। উদ্দেশ্য মহৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ পরাধীন দেশের শিক্ষাদর্শের ভিত্তিতে কোনো স্বাধীন দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না। নতুন রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সঙ্গতিসাধন অবশ্যই প্রয়োজন। সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তা হলো— 'The Educational system in Pakistan should be inspired by Islamic Ideology emphasizing among any of its characteristics those of Universal brotherhood, tolerance and justice.' সম্মেলনে 'An Advisory Board of Education for Pakistan' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয় এবং সেই বোর্ড প্রতি বছর পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে গৃহীত ওই সিদ্ধান্তের আলোকে পাকিস্তানের শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে। ১৯৪৮ সালের ৭-৯ জুন করাচিতে বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রধান আলোচ্যসূচি ছিল— 'To consider the question of

www.pathagar.com

providing facility for religious instruction in private schools which receive grant-in-aid from Government.' বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, 'That religious instruction should be compulsory for Muslim students in schools and also for student of other communities should they so desire.' বাণিজ্য ও শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে বোর্ডের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১৪-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে। সভাপতির ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ১৯৪৭ সালের শিক্ষাসম্মেলনে গৃহীত সর্বজনস্বীকৃত ইসলামি ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে বলেন, 'It is essential that they should undertake an intensive study of the life of the Prophet of Islam and the Holy Quran, for it is only by such a study that the Muslims as well as non Muslims can appreciate the Universality of Proper Understanding, make an effective contribution to the development of the education of the state of which they are citizens.' একই বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তানে বসবাসকারী অমুসলিমদের উদ্দেশে বলেন, 'Nor do I mean that non-Muslims should study the holy Quran in Arabic, what I mean is that they should study fundamental principals of Islam on which we have based our educational ideology.'। কারণ তাঁর কথায় 'Non Muslims who have accepted Pakistan as their state have done so with the knowledge that it should be so run as to enable the Muslims to live their own way of life and to play their legitimate role in creation of a new world.' মধ্যযুগে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো যেমন শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এসে বোর্ড উক্ত সভায় সেই ধারায় মসজিদগুলোকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ইমামদের মসজিদের ইমাম পদে নিয়োগ করা হবে। তাই সিদ্ধান্ত হয়, 'in order to make sure that the right type of men are appointed imams the appointment should be controlled by the state through its educational agencies.' শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের সকল ধর্মের প্রতি যে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল, স্বাধীন পকিস্তানের জন্য তা প্রযোজ্য নয়— এই যুক্তিতে বোর্ড সব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্মতত্ত্ব' বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

শিক্ষামন্ত্রী, ড. মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে বোর্ডের পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয় বাহাওয়ালপুরে ১৯৫৩ সালের ৪-৫ মার্চ। উদ্বোধনী ভাষণে বাহাওয়ালপুরের হযরত আমীর-এ-আলা ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, 'it is only proper that religious education that can discipline one to distinguish right from

www.pathagar.com

wrong, differentiating his own rights from those of others, it teaches good fellowship and a sense of brotherhood for humanity at large.' কিন্তু সভাপতির ভাষণে মাহমুদ হাসান এই গতানুগতিক ভাষণের সাথে একমত না হয়ে ইসলামের গতিময়তা ও মুক্তচিন্তার ইতিহাসের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, যেসব ধারণা মনের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু যা কোনো কাজে লাগে না, যার সত্যাসত্য পরীক্ষা করা যায় না, সেসব ভাবনা মৃত। 'We must also warn ourselves against obscurantism masquerading as Islam, and carrying us backwards rather than forward.' সবাইকে উপলব্ধি করতে বলেন, 'Those who have taken the trouble to study the message of Islam know that its sprit is dynamic rather than static and throughout its glorious history Islam has encouraged experiment and freedom of enquiry in all spheres of life, including that of education.'

পূর্ব-পাকিস্তানের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল ও পুনর্গঠনে সুপারিশ পেশ করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করেন। প্রথম বৈঠক উদ্বোধনের সময় দেশ ও জাতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'the system must be based on equal opportunities for all, must not encourage an exclusive type of education based on class distinction or class value.' তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্মূল্যায়ন সম্পর্কে সাহসী মতপ্রকাশ করলেও ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত ভাবাদর্শের বিষয়ে নিশ্চুপ ছিলেন। অন্যদিকে আবার, তিনি ধর্মশিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে ধর্মশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে 'ধর্মতত্ত্ব' বিভাগ খোলার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'A reappraisal of the Madrasa type of education is also called for this education does not do any good either to individual or to the society. No confusion should, however, be made between Madrasa and religious education. Let us have religious education by all means. Theory can be taught without the present wasteful and primitive type of education. Adequate provision should be made at the university stage for bearing classical subjects such as Arabic and Persian as Greek and Latin are taught in British University.' কমিশনের অন্যতম সদস্য ড. কুদরত-এ-খুদা একটি আলাদা সুপারিশে বলেন, '...what really are our requirements? Some people say that in a Muslim state the education should give a chance to the country to become and live the necessity of

www.pathagar.com

making the country religious through education and thus the much expected improvement will come'. কিন্তু ড. কুদরত-এ-খুদা তা মনে করেন না। বরং ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি প্রাক-প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি শিক্ষাধারা প্রচলনের প্রস্তাব দেন। ধর্মশিক্ষাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তার জন্য একটি আলাদা ধারার প্রস্তাব করেন। তবে ধর্মশিক্ষার নামে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে আরবি ও উর্দুর প্রচলন সম্পর্কে তিনি দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'A severe blow to primary education was dealt a few years ago, by introducing Arabic and Urdu as a compulsory subject in primary schools'. বস্তুত জনাব আতাউর রহমান ও ড. কুদরাত-এ-খুদার বক্তব্যের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই— উভয়েই সমতাভিত্তিক একই ধারার একটি শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে, উভয়ই মাদ্রাসা শিক্ষার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এই বক্তব্য থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ধর্মান্ধ শিক্ষা আদর্শের সাথে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সেক্যুলার শিক্ষা আদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে, সামরিক ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এস. এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন উদ্বোধনের সময় আইয়ুব খান দৃঢ়তার সঙ্গে 'আমাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের' আলোকে পাকিস্তানের চলমান শিক্ষাপদ্ধতি ঢেলে সাজাবার আহ্বান জনান। প্রতিবেদনের মুখবন্ধে কমিশন আরও স্পষ্টভাবে বলে, 'The moral and spiritual value of Islam combined with the freedom, integrity and strength of Pakistan should be the ideology which inspires our educational system.' শরীফ কমিশন ধর্মশিক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে :

ক. বাধ্যতামূলক স্তর : ১ম-৮ম শ্রেণি;

খ. নৈর্বাচনিক স্তর : ৯ম-১০ম শ্রেণি;

গ. গবেষণা স্তর : উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

পাকিস্তানের যেকোনো নীতি প্রণয়নে তিনটি মৌলিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়— ধর্ম, মধ্যযুগীয় মুসলিম ধ্যান-ধারণা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা। বস্তুত এই ধারণার বিপরীতেই আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কথা এখানে তুলে ধরেছি যার মূলে রয়েছে সর্বজনীনতা (Universalism) ও মানবতাবোধ (Humanism), যে দাবি আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই. এইচ কোরেশী, যিনি ১৯৪৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ১৯৭৫

www.pathagar.com

সালে তাঁর লেখা 'The Education of Pakistan' বইতে লেখেন যে, 'সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহে মৌলিকতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া ছিল না'। তবে বিন্দুমাত্র ছোঁয়া না-থাকলেও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটিই সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করে এসেছে এবং শিক্ষার এই পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শটি ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের শিক্ষাকাঠামোকে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও সেক্যুলার শিক্ষার পথ থেকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে এনেছে।

৫. ভারতের অভিজ্ঞতা

এবার ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার অভিজ্ঞতার দিকে আমরা দৃষ্টি দেব। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর ভারত সরকার প্রখ্যাত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করে ও ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ওপর রিপোর্ট প্রণয়নের দায়িত্ব দিলেও কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ রাখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের কতিপয় ধারা উল্লেখ করে সেগুলোর ওপর, বিশেষ করে ১৯ (১), ২১ এবং ২২ (১)-(২) ধারাগুলোর ওপর কমিশন তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত ও গুরুত্বারোপ করে। ১৯ (১) ধারায় বলা হয়, 'Subject to public order, morality and health and the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion'. এ ধারাটি ব্যক্তির বিবেক, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ ও ধর্মাচারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। ২১ ধারায় বলা হয়েছে, 'No person may be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.' ২২ (১) ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund.' সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না। এই ধারার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে কমিশন মন্তব্য করে যে, যেহেতু ভারতে বহুধর্মের মানুষ বাস করে, সেহেতু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সবার ধর্মশিক্ষা দেওয়ার আশা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকারের মতে, 'রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলার অর্থ হলো অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলা।' তবে একজন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের কিংবা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকারও সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Provided that nothing in this clause

www.pathagar.com

shall apply to an educational institution which is administered but has been established under the endowment or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institutions.' ২২ (২) ধারার মূল বক্তব্য সরকার অনুমোদিত কিংবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তিকে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধ্য করা যাবে না। 'No person attending any educational institutions recognized by the state or recieving aid out of state funds shall be required to take part in any religious institutions attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached there to unless such person of if such person in his minor guardian has given his consent there to.'

এভাবে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের অবস্থান নির্ণয়ের পর ধর্মের অপব্যবহার, গণতন্ত্র ও ধর্ম, ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ভারতবাসীর মনোভাব, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা (freedom of Inquiry), ধর্মের মূল্য, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মদর্শনের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে। কমিশন মনে করে যে, 'to be secular is not to be religiously illiterate. It is to be deeply spiritual and not narrowly religious.' বাস্তবতার নিরিখে কমিশন মনে করে যে, 'Religion cannot be imparted in the form of lessons. It is not be treated as one a number of subjects to be taught in measured hourly doses. Moral and religious instruction does not mean moral improvement.'

দেখা যায় যে, দেশভাগের পর থেকে ভারত একটি বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ও সংবিধান রচনার পথে এগিয়ে গেছে। সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা যে রাষ্ট্রের একটা বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব একথা স্বীকার করে উক্ত ধারায় ১০ বছরের সময়সূচি নির্ধারণ করেছিল। একটা জাতির জন্যে অন্তত ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষার একটি সর্বজনীন, ভিত্তিভূমি ও কার্যকারিতা থাকা দরকার। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও ভারতীয় সংবিধান তা ভালোভাবে উপলব্ধি করে। এই বয়সসীমাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে নিম্ন ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সর্বজনীন করার দাবি উঠেছে।

আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, ক্লাসভিত্তিক যে কারিকুলাম গোটা উপমহাদেশে বিদ্যমান তা কিন্তু মোটামুটি সারা বিশ্বেই অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৪৭

www.pathagar.com

সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াস পায়, যা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ে সংস্কার আনার লক্ষ্যে তারাচাঁদ কমিটি (১৯৪৮), রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮), মুদালিয়ের কমিশন (১৯৫২-৫৩), আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীর রিপোর্ট (১৯৫৪), দে-কমিশন (১৯৫৪), কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬), সম্পূর্ণানন্দ কমিটি (১৯৬৮) ইত্যাদি কমিশনগুলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি সদ্য স্বাধীন দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে। এ প্রচেষ্টাগুলো ছিল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিময় ও প্র্যাগমাটিক, পাকিস্তানের মতো পেছনে হাঁটা ছিল না। ফলে আধুনিক ভারতবর্ষ নির্মাণে এসব সুপারিশ ছিল ফলদায়ক। নানারকম তর্ক-বিতর্কের ধারা অবশ্য এখনো বজায় রয়েছে, যা একটি চলমান সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের দৃষ্টি প্রগতিশীল একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৬. আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষানীতিসমূহের পর্যালোচনা

অবশ্য ব্রিটিশ আমলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা বলা হয়েছে এবং চেষ্টাও করা হয়েছে। যেমন, ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন একটি বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি চালুর প্রস্তাব দেন এবং আগামী ৪০ বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে কার্যকর করার উপর জোর দেন। পাকিস্তানি আমলে ১৯৪৯ সালে মওলানা আক্রাম খানের নেতৃত্বে গঠিত East Bengal Educational System Reconstruction Committee'র ১৯৫১ সালে প্রকাশিত সুপারিশে ব্রিটিশ আমলের ১ম-৪র্থ শ্রেণিভিত্তিক স্তরকে ১ম-৫ম শ্রেণিভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদি স্তরে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের মাইনর স্কুলের (Middle English School) ধারণা পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ মাইনর স্কুলের ৫ম শ্রেণিকে প্রাইমারির সাথে আর ষষ্ঠ শ্রেণিকে হাইস্কুলের সাথে যুক্ত করা হয়। সুতরাং প্রবেশিকা স্তর হলো ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি। অর্থাৎ স্কুলশিক্ষার কাল হলো মোট ১০ বছরব্যাপী। প্রাথমিক স্তরে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়স ৬ বছর। সে হিসেবে একজন শিক্ষার্থীর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত হয়েছিল ১৬ বছর। কিন্তু এই সীমা আক্ষরিকভাবে মানা হয় নি। ১৩ বা ১৪ বছর লিখে অভিভাবকরা ম্যাট্রিক পাস করিয়েছেন সন্তান-সন্ততিদের। স্কুল বা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে নি। আক্রাম খানের সুপারিশে দু'বছর কলেজীয় স্তরকে 'মাধ্যমিক' (Intermediate)-কে অবলুপ্ত করে এর একটি বছর স্কুলের ১০ম শ্রেণির সাথে যুক্ত

www.pathagar.com

করে ১১শ শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ান, আর একটি বছর ডিগ্রি কোর্সের সাথে যুক্ত করে ডিগ্রি কোর্স ২ বছরের স্থলে ৩ বছর মেয়াদি করা হয়। আক্রাম খানের সুপারিশমালা অবশ্য গৃহীত হয় নি, তবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ৪ বছরের জায়গায় ৫ বছর মেয়াদি করা হয়।[৩৩]

১৯৫৪ সালে ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচন ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, সেখানেও সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার একটি দাবি ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন না-হওয়া পর্যন্ত জনগণের সে দাবি পূরণ হয় নি।

৭. বাংলাদেশের অভ্যুদয় : এগিয়ে যাওয়ার পালা

বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হয় এবং ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়, আর তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, তখনকার পূর্ববাংলা, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তান সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে দেরি হয় নি, বিশেষ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে। ১৯৪৮ থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তা চরম আকার ধারণ করে এবং শহীদের রক্তের বিনিময়ে অবশেষে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে স্থান পায়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশে ইসলামি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাংলাভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিনির্ভর বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে এদেশে ক্রমাগত স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র— এই চারটি দর্শন মূলনীতি হিসেবে স্থান পায়।

৭.১ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন

নতুন রাষ্ট্রের নতুন ভাবাদর্শের দিকে লক্ষ রেখে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজন জরুরি হয়ে দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, ১৯৭৩ সালের ৮ জুন কমিশন তার অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। এই প্রথম পাকিস্তানের গতানুগতিক ধর্মভিত্তিক আদর্শ থেকে সরে এসে কমিশন জাতিকে উপহার দেয় একটি

www.pathagar.com

সেক্যুলার ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ২.৪ ধারায় কমিশন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।'

কমিশন প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে। সপ্তম অধ্যায়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা' নিয়ে আলোচনা করে এবং ৭.৪ ধারায় উল্লেখ করে যে, 'দেশে জনগণকে জাতীয় কর্ম ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হলে একটি সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যক।' এ পর্যায়ের শিক্ষা যে বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার কমিশনের পরের বাক্যেই তা প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, 'এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন পর্যায়ের হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীন নাগরিকের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার ও তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে আট থেকে বারো বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চালু আছে।' তাই কমিশন মনে করে যে, 'আট বছরের কম মেয়াদি স্কুল শিক্ষায় সব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয় এবং অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও অন্যান্য যেসব কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ আমরা করেছি সেগুলোর সুষ্ঠু ভিত্তি রচনাও সম্ভব নয়।' তাই কমিশন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, 'সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য এই আট বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক।' এই উপলব্ধি থেকে কমিশন সুপারিশ করে যে, 'প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।' এভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার এক ধারাবাহিক সময়সীমা বেঁধে দেয় কমিশন। কিন্তু সেটা আইনে পরিণত করতে বিভিন্ন সরকার ১৮ বছর সময় নেয়। কিন্তু আজো বাংলাদেশে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সব শিক্ষা কমিশন ও কমিটি ৫ বছরের জায়গায় ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা স্তর নির্ধারণ করলেও বিএনপি সরকারের শিক্ষানীতি ২০০৩ সালের নামে শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর রাখারই সুপারিশ করেছে। কাকতালীয় মনে হলেও ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিশন ৪০ বছরের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার প্রস্তাব করেছিল, খুদা কমিশনের সময়সীমা সেখানেই শেষ হয়। সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক একমুখী এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করে এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'ধর্মশিক্ষা' অথবা নীতিবিষয়ক

www.pathagar.com

শিক্ষা আবশ্যক বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়। (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ ।[৩৪]

খুদা কমিশনের আর একটি ব্যতিক্রমী পর্যবেক্ষণ ছিল যে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে অনেক পাঠ্যবিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় এবং ৯ম-১২শ শ্রেণিতে দেওয়া চার বছরের পাঠ্য কোর্স তিন বছরে অর্থাৎ ৯ম-১১শ শ্রেণিতে শেষ করা সম্ভব। এতে এক বছর শিক্ষার্থীর জীবন থেকে বেঁচে যায় এবং পুনরাবৃত্তিরও অবসান হয়। তাই ১১শ শ্রেণির স্কুল শিক্ষা এবং ৩ বছরব্যাপী সাধারণ স্নাতক ডিগ্রি কোর্স প্রচলিত হওয়া দরকার। তবে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন সুপারিশ করে, 'নীতিগতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হলেও আমাদের বর্তমান অবস্থায় তা বাস্তবায়নের পক্ষে বহু বাধা অতিক্রম করতে হবে...। ...সবকিছু বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলুক। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ক্রম রূপায়ণের কার্যক্রম স্থির করা যাবে।'

সুতরাং যতদিন না পরীক্ষা সফল প্রমাণিত হচ্ছে, মাধ্যমিক শিক্ষা হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। কমিশনের সুপারিশ 'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।' সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয় :

ক. বৃত্তিমূলক শিক্ষা; এবং

খ. সাধারণ শিক্ষা।

অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির সব ছাত্রের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে নি উক্ত কমিশন। কর্মমুখী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উচ্চশিক্ষা কেবল মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করেছে কমিশন। মাধ্যমিক শিক্ষায় ধর্মশিক্ষাকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো সেই লর্ড কার্জনের আমল থেকে মাধ্যমিককে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আর স্নাতক কোর্সকে ৩ বছর মেয়াদি করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক হয়েছে, যা সমাজে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক মিলে মাধ্যমিক স্তর ৯ম-১২শ শ্রেণির এই শিক্ষাক্রম সমাজ মেনে নিয়েছে। এ নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতেও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে একাদশ শ্রেণির স্কুল ফাইনাল শিক্ষাক্রম ফলপ্রসূ হয় নি এবং অবশেষে তা পরিত্যক্ত হয়েছে— যদিও কোনো কোনো রাজ্যে চালু আছে। প্রাথমিক শিক্ষা

www.pathagar.com

সম্পর্কে খুদা কমিশনের সুপারিশ আমরাও সমর্থন করি এবং আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা রূপকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা অসঙ্গত নয় যে, স্বাধীনতার পর পার্শ্ববর্তী ভারত সরকারও ছয় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত আট বছরের সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারামতে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কাজেই ইতিহাস প্রমাণ করে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার দাবি অনেক দিনের। এ দাবির পেছনে নিশ্চয়ই উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিও ছিল এবং এর প্রয়োজনীয়তা আজ আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

এই রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট ও উত্তম যুগোপযোগী বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। তার সবকিছুই গ্রহণযোগ্য ছিল, একথা বলা যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও আধুনিক যুগের অনুপযোগী বলা সত্ত্বেও এর আধুনিকায়নের সুপারিশ এবং উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য সমালোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মূল সুপারিশগুলো যে ইতিবাচক (positive) ছিল, প্রগতির পক্ষে ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবসমূহের যদি কিছু বাস্তবায়ন হতো, তাহলে এর সমালোচিত সুপারিশগুলোকে সংশোধন করে আরও উন্নত, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাকাঠামো গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জেলহত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকাঠামোর যে পরিবর্তন হয়, সেখানে কুদরত-এ-খুদার সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কোনো উপায় থাকে নি। কেননা এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়েই আমাদের পশ্চাৎযাত্রা শুরু হয়ে যায়— সেক্যুলারিজম থেকে ধর্মান্ধতার দিকে। আর রিপোর্টটি যথারীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে স্থান লাভ করে। খুদা কমিশনের প্রতিবেদনটি মোটামুটিভাবে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের (UNESCO, UNICEF ইত্যাদি) সকল শিক্ষা সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, ক্লাসভিত্তিক যে কারিকুলাম গোটা উপমহাদেশে বিদ্যমান, তা কিন্তু মোটামুটি সারা বিশ্বেই অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পাকিস্তান তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াস পায়, যা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। এবার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকানো যাক। ভারতে স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ে সংস্কার আনার লক্ষ্যে তারাচাঁদ কমিটি (১৯৪৮), রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮), মুদালিয়ের কমিশন (১৯৫২-৫৩), আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীর রিপোর্ট (১৯৫৪), দে-কমিশন (১৯৫৪), কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬), সম্পূর্ণানন্দ কমিটি (১৯৬৮) ইত্যাদি কমিশনগুলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছে এবং

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি সদ্য স্বাধীন দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে। এ প্রচেষ্টাগুলো ছিল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিময় ও প্র্যাগমাটিক, পাকিস্তানের মতো পেছনে হাঁটা ছিল না। ফলে আধুনিক ভারতবর্ষ নির্মাণে এসব সুপারিশ ছিল ফলদায়ক। নানারকম তর্ক-বিতর্কের ধারা অবশ্য এখনো বজায় রয়েছে, যা একটি চলমান সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের দৃষ্টি প্রগতিশীল একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৮. আমাদের পশ্চাৎযাত্রা শুরু

৮.১ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন

জিয়ার উদ্যোগ : ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর একটি রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি 'জাতীয় শিক্ষা কর্মশালা' উদ্বোধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার পশাপাশি অর্থাৎ সেক্যুলার শিক্ষা কার্যক্রমকে 'ব্যালেন্স করার জন্য' পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদের নেতৃত্বে একটি 'শিক্ষা পরিষদ' (Education Council) গঠিত হয়। জিয়াউর রহমানের উক্ত ঘোষণার প্রতি অনুগত থেকে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই শিক্ষা পরিষদ।

এরশাদ কর্তৃক ধর্মকে বাধ্যতামূলককরণ : অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতা দখলকারী (১৯৮২) তৎকালীন সেনা প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে তাঁর পূর্বসূরির মতো আব্দুল মজিদ খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। 'বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি' অব্যাহত রাখার জন্য তিনি প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। অতঃপর তাঁরই আদেশে ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. মফিজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ২৮ সদস্যের একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়, যেটি ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশনের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো— 'সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি— এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও ধর্ম প্রেরণার উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।' সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে কমিশন প্রথম শ্রেণি থেকে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণিতে আরবি অথবা অন্য একটি ভাষা

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এরশাদ সরকার নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা প্রথমবারের মতো বাধ্যতামূলক করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭-এর প্রতিবেদন : আওয়ামী লীগের শাসনামলে ১৯৯৭ সালে প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি'। কমিটি মুখবন্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রতি বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে এবং বলে 'রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ একটি গণমুখী ও সর্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত।' কমিশন ৩.১ ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা মেয়াদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় যে, 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিকে নিম্ন-মাধ্যমিক এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর নামকরণ করতে হবে।' ৩.২ ধারায় সুপারিশ করা হয় যে, 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করতে হবে।' প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে কমিটি সুচিন্তিত মতপ্রকাশ করে। ৫.৩ ধারায় কমিশন শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করার পর তাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখাবার সুপারিশ করেছিল। ইংরেজি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। কমিটি বলছে, 'ইতোমধ্যে ১৯৯১ সাল থেকে সরকারের এক নির্বাহী আদেশবলে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী চালু করা হয়েছে, অথচ অধিকাংশ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ইংরেজী শিক্ষা যেনতেন প্রকারে সমাধা করা হচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার এবং প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষাদানের মান উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।'

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শামসুল হক কমিটি মনে করে, 'আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা যেমন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষা, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। মান ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এসব ভিন্ন।' এর ফলে জাতির কী ক্ষতি হয় কমিশনের চোখে তাও ধরা পড়ে। বলা হয়, 'ফলে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার মধ্যে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়। তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে সমমানের সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার

www.pathagar.com

ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অন্তত প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।'

মাধ্যমিক শিক্ষাকে তিনটি উপব্যবস্থায় ভাগ করা হয় :

১. সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা;
২. ভোকেশনাল শিক্ষা উপব্যবস্থা; এবং
৩. মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা।

১ এবং ২ উপব্যবস্থায় নবম ও দশম শ্রেণিতে আবশ্যিক ৬০০ নম্বরের বিষয়ের পাঁচটির মধ্যে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

অনেক ভালো ভালো কথা থাকলেও এই কমিশনের মূলদর্শন পশ্চাৎমুখী। বিজ্ঞান শিক্ষাকে দেখা হয়েছে জীবনের সুখসুবিধা লাভের উপায় হিসেবে, এর যে মূলশক্তি শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ ও বিশ্লেষণধর্মী এবং জিজ্ঞাসু মনন তৈরি করা, সেদিকটি তুলে ধরা হয় নি। বরং শিক্ষার্থী যাতে অতিমাত্রায় ধর্মভীরু, ধর্মাশ্রয়ী অন্ধবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে ওঠে, সেদিকে জোর দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩-এর প্রতিবেদন : সর্বশেষ চারদলীয় জোট সরকার ২০০২-এর ২১ অক্টোবর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। কমিশন ২০০৪-এর মার্চে প্রতিবেদন পেশ করে। মিয়া কমিশন পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ধারাকে সমর্থন করে তাকে 'সুসংহত' করার সুপারিশ করে। 'প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য' সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.২.১ ধারায় বলা হয়, 'শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।' স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হলেও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনো বহুদূরে। মিয়া কমিশন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে 'অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি শাখা খোলা প্রয়োজন' মনে করে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের দক্ষতা অর্জনকারী কিছু পদ্ধতির উল্লেখ করে এবং শিশুশিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত শিশুদের জীবনে দক্ষতা অর্জনের ধারাকে প্রধানত পাঁচটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করে। যেমন সংবেদনশীলতা, ভাষাগত যোগ্যতা, সামাজিকীকরণ, শারীরিক যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা— এ সবই গৎবাঁধা কথা ও চর্বিতচর্বণ। এই কমিশনের সুপারিশের সব চাইতে অনিষ্টকর কয়েকটি হলো :

www.pathagar.com

১. শিক্ষার্থীকে, বিশেষ করে শিশু শিক্ষার্থীকে অতিমাত্রায় ধর্মান্ধ করে তোলার প্রয়াস, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা ও মুক্তচিন্তার বিকাশ হবে না, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে না।

২. শিক্ষার লক্ষ্য কখনো দেশের 'জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করা' হতে পারে না। শিক্ষাকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে গণ্য করা এবং জনগণকে মানবসম্পদ (human capital), অর্থাৎ বিনিয়োগের উপকরণরূপে বিবেচনা করা একটি যান্ত্রিক ও শোষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা আমাদের মূল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবু বলা যায়, শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর অন্তরে যে অমিত সম্ভাবনা ও প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তাকে যথাযথ শিক্ষা প্রণালির মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলা, কর্মে ও বুদ্ধিতে একটি সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. পশ্চাৎপদ ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা এবং এই শিক্ষাকে সেক্যুলার শিক্ষার সমকক্ষ করে তোলার অপচেষ্টা, যা দেশের মৌলবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করেছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কমিশন সুপারিশ করেছে—

ক. ফাজিল ও কামিল নামের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রির সাথে সমতুল্য বিবেচনা করা।

খ. এ মহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে একটি মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

৪. বর্তমান মাধ্যমিক পর্বে কয়েকটি বিভাজন রয়েছে (কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি) তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটি একত্রীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করার সুপারিশ।

৫. প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ধর্মকে বাধ্যতামূলক করা।

এই সুপারিশের বলে বলীয়ান হয়ে জোট সরকার মাধ্যমিক স্তরে তথাকথিত একমুখী শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে, অথচ মাদ্রাসাসহ অন্য ধরনের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমকে এর আওতায় আনা হয় নি। ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমতুল্যতার স্বীকৃতির সকল আয়োজন সমাপ্ত করে ফেলেছে সরকার। এছাড়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকেও সরকার স্বীকৃতি দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে। সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই নানা ফোরাম থেকে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছে।[৩৫]

www.pathagar.com

৯. অন্যদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান

এতক্ষণ আমরা পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত শিক্ষার মূলস্রোতটি ধরতে চেষ্টা করলাম। পঁচাত্তর পূর্ববর্তী অধ্যায়কে বাদ দিলে, সেটা যে মূলত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় পুষ্ট, এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই মনোভাব যেমন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বিশ্ব সংস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, তেমনি আমাদের সংবিধানেরও বিরোধী। ২০০০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' বিষয়টি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতির অন্তর্গত, তাই রাষ্ট্র কারো ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলাবে না, এটাই প্রত্যাশিত। তাছাড়া আমাদের সংবিধান সকল নাগরিকের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র গ্যারান্টি দিয়েছে ৪১ নম্বর ধারায়। উক্ত ধারার (১) উপধারায় বলা হয়েছে 'আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।' উপধারা (২)-এ বলা হয়েছে, 'কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।'

প্রসঙ্গত যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের ধর্ম-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সকল নাগরিকের নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর উপাসনার অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। কারণ হরাস মান (Horace Mann: ১৭৯৬-১৮৫৯) উনিশ শতকের শেষভাগে সাধারণ স্কুল (common school) প্রতিষ্ঠার যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন, 'The United States was different from the more homogeneous nations of western Europe: It was compound of people of different religious beliefs and of varying ethnic origins and languages, cross cut by special and of the conflicting interests of the United States was to develop the unifying bond of a common culture, there needed to be a common basic education, to develop a sense of national identity and purpose.'

বাংলাদেশেও নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়, বহু জাতপাতের মানুষ বাস করে, বাস করে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অনেক মানুষ, যারা জীবনাচারে, সংস্কৃতিতে ও ভাষায় বাঙালি মূল জনগণ থেকে স্বতন্ত্র। তাই হরাস মানের সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন স্রোতের প্রাথমিক শাখার শিক্ষা চালু থাকার ফলে শিশুদের যোগ্যতার মানদণ্ডে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও

www.pathagar.com

মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি করে। এর ফলে যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় তা যেকোনো সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন।

হরাস মান বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে একটি একমুখী, সাধারণ শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি করা দরকার। মান প্রদর্শিত সেই পথ ধরে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সবার জন্য একই মৌলিক শিক্ষাস্তর চালু হয়েছে। কারণ আমেরিকার সংবিধান বলছে, 'If the state is given power to direct religious matters the freedom of religion would cease.' কারণ রাষ্ট্র যদি কারো ধর্মবিশ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে ধর্মের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হবে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানেও ধর্ম-সংক্রান্ত একই রকম কথা বলা হয়েছে। সংবিধান বলছে, 'The commonwealth shall not make any law for establishing any religion for imposing any religious observance or for prohibiting the free excercise of any religion and no religious text shall be requried as a qualification for any office of public trust under the commonwealth.'। এভাবে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। আরও বলা হয়, 'It recognises the right of every man and women to worship or not to worship God according to the dictates of his or her own conscince.' সেজন্যই বর্তমানে প্রায় সকল উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের ইহজাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে কারো ধর্মবিশ্বাসের ওপর কোনোরকম হস্তক্ষেপের পথও বন্ধ করা হয়েছে। এটাই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. *লালন*, সুধীর চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ২০০১

২. *শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে*, পৃষ্ঠা ২১, বদরুদ্দিন উমর

৩. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

৪. *Convention against Discrimination in Education*, Adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 14 December 1960

৫. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

৬. *বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য : প্রসঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা ও ক্যাডেট কলেজের সহাবস্থান*, মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সম্পাদনা হোসনে আরা শাহেদ, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০২

৭. Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh, UGC of Bangladesh, April 2006

৮. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

৯. জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩, প্রকাশ কাল, ১৯৭৪ (মার্চ)

১০. *মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ*, আবদুল হক ফরিদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা এবং *দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শিক্ষা দর্শন*, সংকলক শেখ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার জাহানাবাদী।

১১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

১২. প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭

১৩. জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩, প্রকাশ কাল, ১৯৭৪ (মার্চ)

১৪. *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, আবদুস সাত্তার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

১৫. Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee, 1949, East Bengal Government. মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন *মাদ্রাসা শিক্ষা : একটি পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা*, মুজিব মেহদী, বাংলদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০১

১৬. ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৬। *ফাজিল-কামিলের ডিগ্রি ও মাস্টার্স মান : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনা*, মাওলানা হোসেন আলী, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ আয়োজিত ২৯-০৯-০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দান এবং ফাজিল-কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত।

১৭. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩, প্রকাশ কাল, ১৯৭৪ (মার্চ)। প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭

১৮. *Outlook*, January, 2006 (http://www.outlookindia.com)

১৯. রয়টার, জানুয়ারি ২, ১৯৯৯

২০. Education Commission in India, 1966, কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

www.pathagar.com

২১. Education sector in Vietnam-ADB's Road Map: Toward Secondary Education or All, 2003

২২. *বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য : প্রসঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা ও ক্যাডেট কলেজের সহাবস্থান*, মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সম্পাদনা হোসনে আরা শাহেদ, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০২

২৩. প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭

২৪. Report of the East Bengal Educational System Reconstruction Committee, 1949, East Bengal Government.

২৫. *Outlook*, January, 2006 (http://www.outlookindia.com)

২৬. Education sector in Vietnam-ADB's Road Map: Toward Secondary Education or All, 2003

২৭. Declaration on Education For All http://www.unesco.org/ education/ efa/ ed for all/ background/jomtien

২৮. *শিশু ও বিজ্ঞান*, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিশোর বাংলা (শারদীয়), ১৩৫৭ (সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা ৭০০ ০০৬, ১৩৯৯)

২৯. *জাতীয় উন্নতির উপায়*, মেঘনাদ সাহা, নব্যভারত, ৩৪ খণ্ড, পৃ ৩৭৬, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ (১৯২২)

৩০. *শিক্ষা সঙ্কট*, কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, পৃষ্ঠা ২৪৫, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সিরিজ, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৩ (২য় সংস্করণ)

৩১. Education sector in Vietnam-ADB's Road Map: Toward Secondary Education or All, 2003

৩২. *বিশ শতকের বাংলাদেশ : বিজ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশ*, অজয় রায়, একুশের প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী, ২০০০

৩৩. *শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা : কিছু অনিয়ত ভাবনা*, অজয় রায়, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, হোসনে আরা সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন, ২০০২

৩৪. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

৩৫. *ফাজিল-কামিলের ডিগ্রি ও মাস্টার্স মান : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনা*, মাওলানা হোসেন আলী, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ আয়োজিত ২৯-০৯-০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দান এবং ফাজিল-কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত। *শিক্ষা নিয়ে দু-চার কথা*, অজয় রায়, শিক্ষা আন্দেলনের জাতীয় সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৪

www.pathagar.com

ঐতিহ্য

ISBN 978-984-776-099-5

www.pathagar.com